সেপ্টেম্বর ২০২৪ ■ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

শরতের আগমন

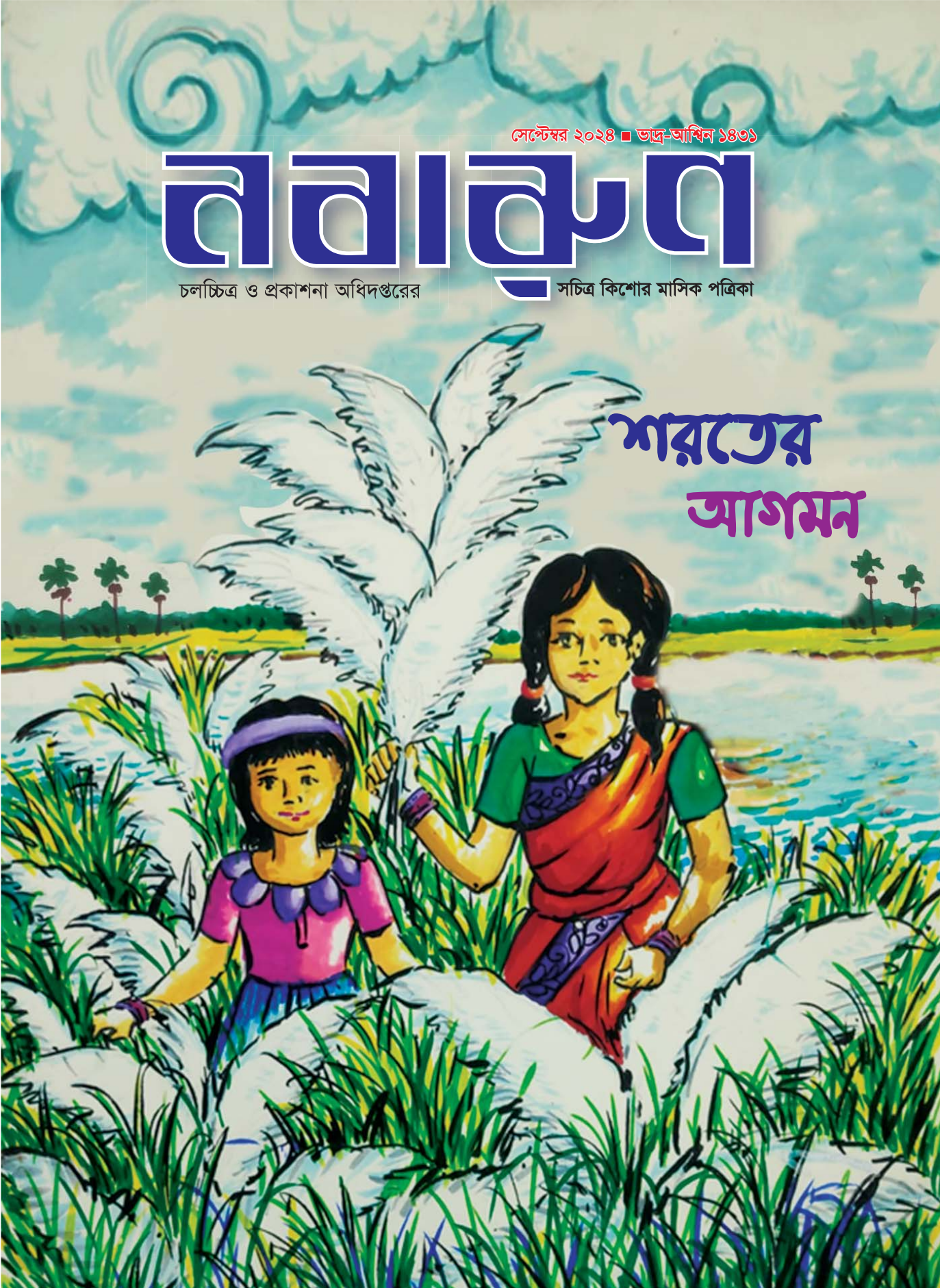

আলীশা আমরীন ইসলাম, পঞ্চম শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল, ঢাকা

ইউসুফ হায়দার আদিব, দ্বাদশ শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কাকরাইল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

প্রকৃতিতে মনভোলানো রূপের ঋতু শরৎকাল। সাদা কাশফুল, শিউলি, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় শরতের ছুটে চলার স্নিগ্ধতা এক কথায় অসাধারণ। নীল আকাশে তুলার মতো ভেসে বেড়ায় মেঘ, চলে আলো-ছায়ার খেলা। কখনো মেঘ, কখনো বৃষ্টি, আবার কখনো রোদের ঝলকানি।

শরতের অন্যতম আকর্ষণ কাশফুল। নদীর তীরে রাশি রাশি কাশফুল অপরূপ শোভা ছড়ায়। এ ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য বিমোহিত করে সবাইকে। রাতের রানি শিউলি ফুলের সুঘ্রাণেও অনুভূত হয় শরতের ছোঁয়া। আরও ফোটে বেলি, দোলনচাঁপা, বকুল, শালুক, পদ্ম, জুঁই, কেয়া প্রভৃতি। এসময় মাঠে মাঠে সবুজ ধানের ওপর সোনালি আলোর ঝলমলে রূপের দেখা মিলে। অপেক্ষায় থাকে কৃষকেরা নবান্নর।

বন্ধুরা, প্রকৃতির নিয়মে শরৎ এসেছে, সেই নিয়মেই চলে যাবে। এসো হৃদয় দিয়ে শরতের সৌন্দর্য উপভোগ করি। কতই না অপরূপ সাজে সেজেছে শরৎ রানি। শরৎ দেখে আমাদের মন যেন খুশিতে ভরে উঠে।

এর সাথে এসো শরতেও আরেকবার সালাম জানাই ছাত্র-গণআন্দোলনে আহত ও শহিদদের।

ভালো থেকো তোমরা সবাই আর সাথে থেকো নবারুণের।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

০৩ শরতের আগমন/ মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন
৪৫ প্রিয় ঋতু/ মোহাম্মদ অংকন
৪৮ নির্বাচনি ইশতাহারে 'কচুরিপানা'/ফজলুল হক
৫১ সবার প্রিয় কাশফুল/ মেজবাউল হক
৬০ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

গল্প

৬ কাশবনের হাতছানি/ মোস্তাফিজুল হক
১১ ঋতু রানির সাক্ষাৎ/ আবদুল লতিফ
১৪ কাশফুলের হাসি/ বেগম শামসুন নাহার
২১ ভূতোর বন্ধু নিরু মামা/ আশরাফ আলী চারু
৩৮ ওরে বাবা সাপ/ মুহাম্মদ বরকত আলী
৪১ অক্টোপাসের বন্ধু/ খায়রুল আলম রাজু
৪৩ আলো/ ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

ভূতের গল্প

২৬ চন্দনের দুই রাত/ মাশ্‌হুদা মাধবী

অনুবাদ গল্প

১৭ ফুলের সেতু/জাফর তালুকদার

প্রতিবেদন

৫৩ নবারুণ লেখকের সাফল্য/ মনোয়ারা বেগম
৫৪ শরতের শিউলি/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৫ নারী শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা/ জান্নাতে রোজী
৫৬ কৃত্রিম গাছের রাজ্যে/শাহানা আফরোজ
৫৮ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কবিতাগুচ্ছ

১০ এম হাবীবুল্লাহ
১৩ মো. আনোয়ার কবির/ মো. আকবর আলী
২০ অপু বড়ুয়া
২৪ সুজিত হালদার
২৫ জিহাদুল আলম/ নাসরীন খান
৪২ নুসরাত কিন্তি
৪৭ রফিকুল নাজিম/ কোমল দাস
৫০ নাসরিন জাহান রূপা
৫২ মো. নাজমুল হোসেন

আত্মকাহিনি

৩০ আমি কলার খোসা/ রকিবুল ইসলাম

ছাত্র-গণআন্দোলনের গল্প ও কবিতা

৩৪ আমি খুব ভীতু/ তারিক মনজুর
৩৭ ফরিদ সাইদ

আঁকা ছবি

প্রচ্ছদ : নাবিহা জান্নাত নিধি
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আলীশা আমরীন ইসলাম
ইউসুফ হায়দার আদিব
তৃতীয় প্রচ্ছদ : সাজ্জাদ হোসেন শান্ত/ আফিফা আলম
শেষ প্রচ্ছদ : মেহরাব হাসান জারিফ
৩৭ দীপ্ত দাশ
৫৭ মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য
৬২ নূরেন মাহ্‌যাবিন ওয়াসিমা/ সাবিহা তাবাসসুম ফারিহা
৬৩ ফারিন খান/ রুবামা বিনতে হানিফ
৬৪ রিজওয়ান আল রাহাত/ মীর্জা মাহের আসেফ

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd

শরতের আগমন

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

ঋতু বৈচিত্র্যের বাংলাদেশে প্রতিটি ঋতুই নিজ নিজ রূপবৈচিত্র্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। প্রতিটি ঋতুরই থাকে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ষড়ঋতুর বাংলাদেশের প্রতিটি ঋতুই বাংলার প্রকৃতির রূপ অবিরত পালটে দেয়। বাংলাদেশের প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম আসে প্রচণ্ড গরম ও ফলের সমারোহ নিয়ে। গ্রীষ্মের রৌদ্র দহন শেষ করে বাংলার প্রকৃতিকে ঠান্ডা করতে আকাশে কালো মেঘ করে মুষলধারে বৃষ্টি নিয়ে আসে বর্ষা। বর্ষার স্নিগ্ধ জলধারা শীতল প্রশান্তি এনে দেয় জীবন ও প্রকৃতিকে। এবার তৃতীয় ঋতু শরতের কথা বলি। মেঘ ভারাক্রান্ত বর্ষা ঋতু শেষ হতেই আগমন ঘটে শরতের। তার আগে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের দুটি চরণ বলি, 'আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা, নীল আকাশে কে ভাসালো সাদা মেঘের ভেলা।' ঠিক তাই বর্ষার মুষলধারে বৃষ্টি শেষে স্নিগ্ধ নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা উড়ে বেড়ানো, নদী ও জলাশয়ের তীরে সাদা

রঙের কাশফুল মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতির রূপ পালটে শরৎ এসেছে।

ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। শ্বেত শুভ্র তুলার মতো মেঘের ভেলা নীল আকাশে ভেসে যায়। নদীর পাড়ে সাদা রঙের কাশফুল বাতাসে হেলে দুলে পড়ে। বিল-ঝিলের জলে ফুটে থাকে জাতীয় ফুল শাপলা। এছাড়া পদ্ম, কলমি লতা ও শালুক জাতীয় ফুল জলাশয়ে ফুটে থাকে। গ্রামীণ কিশোর-কিশোরীরা নৌকায় চড়ে বিলেঝিলে ঘুরে ঘুরে শাপলা শালুক তুলে আনে।

শরতের আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, এ সময় সুগন্ধিযুক্ত দেশি ফুলগুলো বাগানে বেশি ফোটে। এর মধ্যে শিউলি ফুল অন্যতম। সকালে গাছের নিচে বিন্দু বিন্দু শিশির কণার মাঝে বিছিয়ে পড়ে থাকা কমলা ডগা সাদা রঙের শিউলি ফুল দেখতে অপরূপ সুন্দর লাগে। তখন মনে পড়ে যায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রিয় গানটি 'শিউলি ফুলের মালা দোলে, শারদ রাতের বুকে ঐ'। শরৎ প্রভাতে ঝরা শিউলির গন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে ভরে ওঠে। এছাড়া বেলি, কামিনি, মল্লিকা, জারুল, মালতি, জুই ও চামেলি ফুল বাগান আলোকিত করে। ফুলের গন্ধে চারদিকে নানা রঙের প্রজাপতির দল ঘুরে বেড়ায়। ভোমরা ও মৌমাছি গুন গুন করে গান করে বাগানের চারদিকে। শরতের প্রকৃতি এত সৌন্দর্য্যে ভরা বলেই এ ঋতুকে বলা হয় 'ঋতু রানি'।

শরৎ মানেই চারদিকে সৌন্দর্য্যের জোয়ার আর আনন্দের উচ্ছাস। বর্ষার বৃষ্টি শেষে মাঠে-প্রান্তরে সবুজের সমারোহ, কচি ধানের ডগার মাঝে সবুজের ঢেউ বয়ে যায় দখিনা বাতাসে।

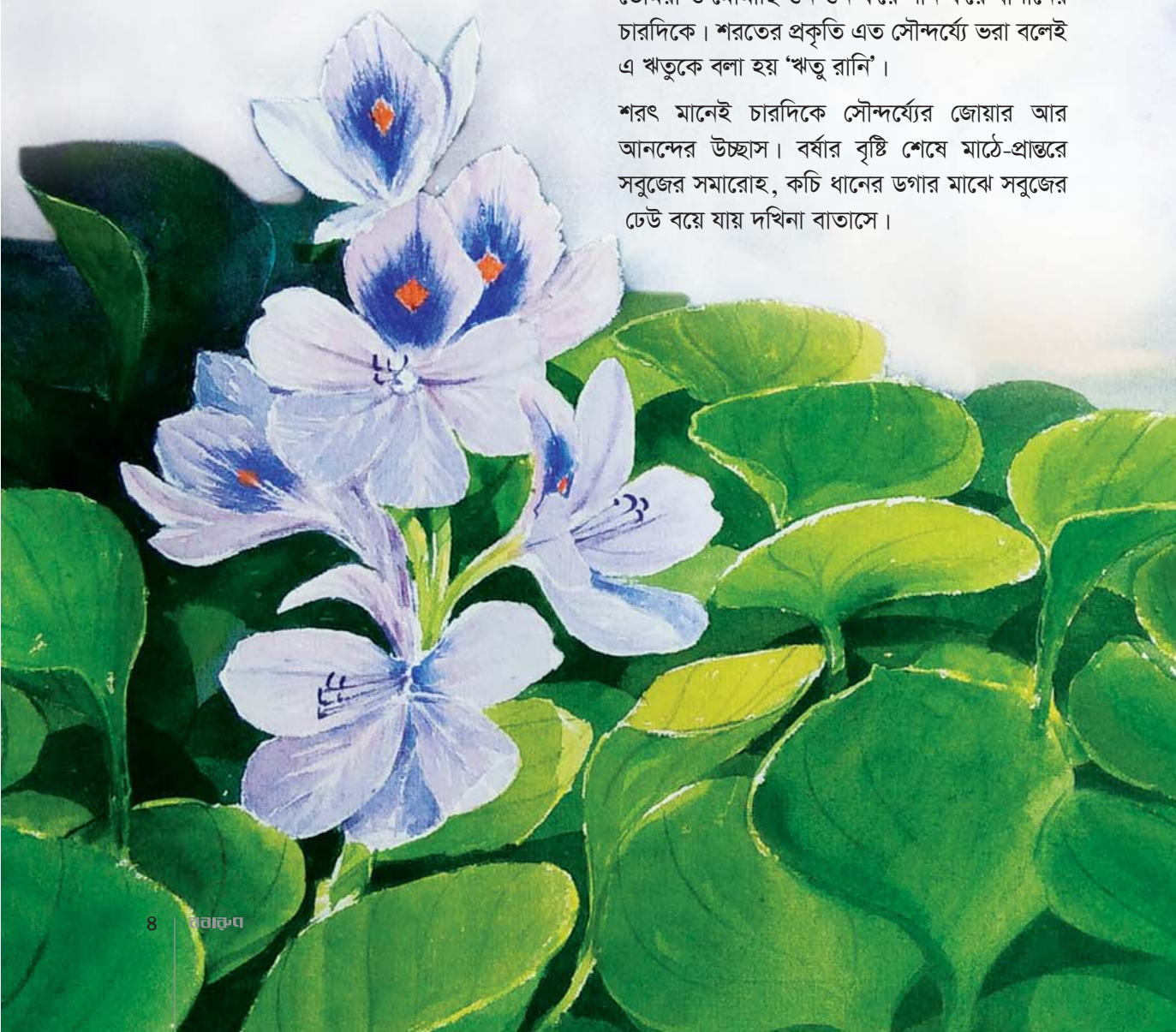

সাদা হালকা মেঘ আনমনে উড়ে বেড়ায় নীল আকাশে। আকাশে নীল রঙের গভীরতাও মনে হয় এ ঋতুতে বেড়ে যায়। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নীরবে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় সাদা চিল ও ঈগল।

শরতের দুপুরেও রোদের তেজ কমে আসে বলে নির্মল লাগে দুপুরকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে শরতের রূপ আরো মায়াবী মনে হয়। শরতের রাতেরও আছে আরও অতুলনীয় রূপ। চাঁদের জোছনা যখন ভরা রাতে সিক্ত শিশির বিন্দু ঘাসের ডগার ওপর পড়ে মনে করিয়ে দেয় শরৎ এসেছে। শরতের পূর্ণিমা রাতে জোৎস্নার আলোয় মন ভরে ওঠে। রাতভর সবুজের বুকে চাঁদ ঢেলে দেয় রূপালি জোস্নাধারা। শরতের জোৎস্নাস্নাত রাতে স্নিগ্ধতা আর কোমলতার অপূর্ব নিদর্শন।

এ ঋতুতে বৃষ্টি তেমন হয় না। তবে রোদের প্রখরতা গ্রীষ্মের চেয়ে কমে আসে। কারণ এ রোদের মাঝে সাদা মেঘের খেলা চলে বলে এরূপ সোনা রোদে মন ছুঁয়ে যায় অচিনপুর। দখিনা হাওয়ায় হেলে দুলে নাচে কাশফুল। ধান ক্ষেতের মাঝেও হাওয়া লেগে ধানের শীষগুলো হেলে দুলে নাচে। প্রকৃতি যেন এক নতুন রূপ ফিরে পায় শরতে।

শরৎকালে গাছে গাছে তাল পাকে। সেই পাকা তাল দিয়ে পিঠা বানায় গ্রাম্য রমনীরা। অপুর্ব স্বাদ সেই পিঠার। বর্ষার পানি কমে যেতে থাকে খাল বিলের মাঝে। এর মধ্যেই পানিতে বালিহাঁস, পানকৌড়ি, বকসহ নানা জলজ পাখি জল থেকে মাছ শিকার করে। এসব দৃশ্য সাধারণত গ্রামীণ পটভূমিতেই বেশি দেখা যায়।

শরতের আরেকটি পরিচিত দিক হলো, এ সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা পালিত হয়। যাকে বলা হয় শারদীয় দুর্গোৎসব। শরতের দখিনা বাতাসে হালকা হিমেল গায়ে আলতো করে মিষ্টি দোলা দেয়। সেই হালকা বাতাসে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। বৃষ্টির জন্য অনেক পাখি বর্ষায় নিজ নীড়ে ঘুমিয়ে থাকে। তাই শরৎ এলে বনে বনে নানারকম পাখির গুঞ্জন শোনা যায়। মিষ্টি সুরে দোয়েল, কোয়েল, শ্যামার গান শোনা যায়।

বর্ষার পানিতে মাঠ-ঘাট জমি প্লাবিত হলেও বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সময় সেখানে রেখে যায় উর্বর পলি মাটি। শরতের শুরুতে কৃষকরা তখন সবুজ স্বপ্ন-বীজ বোনে ফসলের ভরা দিগন্ত জোড়া ক্ষেতে। চারদিকে সবুজের সমারোহ হয়। হেমন্তেই সেই ফসল তারা ঘরে তোলে। এদিক দিয়ে শুধু সৌন্দর্য উপভোগ নয় আয়- উৎপাদনের একটি মৌসুম হলো শরৎ ঋতু।

স্নিগ্ধ বিমুগ্ধ সৌন্দর্য্যই নয় উৎসব আনন্দ আর উৎপাদনের ঋতুও হচ্ছে এই শরৎ। তাই শরতের আগমনে পুলকিত হয়ে ওঠে বাঙালির মন। তাই বাঙালির একটি প্রিয় ঋতু হলো শরৎকাল। শরতের এই সব সৌন্দর্য্য গ্রামীণ জনপদে গেলে বেশি করে উপভোগ করা যায়। ❑

সাংবাদিক, বাংলাদেশ বেতার, প্রাবন্ধিক ও শিশু সাহিত্যিক

গল্প

কাশবনের হাতছানি

মোস্তাফিজুল হক

শিপু কাশবন দেখতে যাবে। এটা তার বহুদিনের ইচ্ছে। কাশবনে গিয়ে সে দুধসাদা কাশফুলের পরশ নেবে। তবে ওদের গাঁয়ে যে রবীন্দ্রনাথের ছোটো নদী, এমনকি কোনো বড়ো নদীও নেই! শিপুর এই ইচ্ছে কী তাহলে অপূর্ণই থেকে যাবে?

ছুটির দিন। শিপু একাই বসে আছে। সে মনে মনে ভাবছে: 'আজকে যদি কোনো এক নদীপথ ধরে কাশবনে যেতে পারতাম।'

শিপু উদাস হয়ে ঝিম ধরে বসে আছে। এমন সময় হঠাৎ কার যেন ডাক শুনতে পেল–

: 'এই শিপু, ঠাঁয় বসে উদাস হয়ে কী ভাবছ?'

শিপু মাথা তুলে সামনে তাকিয়েই ভীষণ অবাক হলো। ঠিক ওর চোখের সামনেই ছোট্ট মায়াবি এক নদী। ওই নদীটা ওর কাছে খুব চেনা চেনা লাগছে। মুহূর্তেই নদীটার নামও মনে পড়ে গেল শিপুর। ওটার নাম মৃগী। নদীটার ঘাটে ভিড়েছে পালতোলা অনেকগুলো ছোটো নৌকা! খুব কাছেই ছোট্ট একটা ময়ূরপঙ্খীও এসে থেমেছে।

: 'কী হলো শিপু, উঠে এসো? ময়ূরপঙ্খী নায়ে চড়ে কাশবন দেখতে যাবে না? আজ তোমাকে শুধু কাশবনই নয়, পদ্মবিলও দেখাবো।'

শিপু আর দেরি না করে ময়ূরপঙ্খীতে উঠে গেল। ময়ূরপঙ্খী লঙ্গরপাড়া ঘাট রেখে বৈশাবিলের দিকে ছুটে চলল। ততক্ষণে মৃগী নাম পালটে তেনাচুরা খাল নাম ধারণ করেছে। সেই খালের জলে ভাসতে ভাসতে একসময় শিপুর ময়ূরপঙ্খী কাশবনে এসে গেল। সে তো মনের আনন্দে পরান ভাইকে বলেই ফেলল, 'পরান ভাইয়া, দেখো, দেখো, কী মস্ত আয়োজন! কাশফুল এতটা দুধের মতো সাদা হলো কী করে?'

: 'শোনো, ওরা শরতের পরিষ্কার নীল আকাশের স্বচ্ছ সাদা মেঘের ছোঁয়া পেতেই এমন দুধসাদা হয়ে ফোটে। তখন ঝমঝম, টুপটাপ, ঝিরঝির বৃষ্টি নামে!'

'জানো ভাইয়া, ঝমঝম বৃষ্টিকে কিন্তু ইংরেজিতে 'ক্যাটস্ অ্যান্ড ডগস' বলে। টুপটাপ আর ঝিরঝির বৃষ্টির পার্থক্যটা কী ভাইয়া?' শিপু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

: 'টুপটাপ বৃষ্টি হলে বড়ো বড়ো ফোটায় বৃষ্টি ঝরলেও একটু পরেই থেমে যায়। ঝিরঝির বৃষ্টিতে আকাশের বুকে সাতরঙা রংধনু ভেসে ওঠে।

: রংধনুর ওই রংটাকে 'বেনীআসহকলা' বলে।

: 'বেনীআসহকলা আবার কী শিপু?'

'পরান ভাই, বেনীআসহকলা মানে হলো- বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।'

: 'শোনো শিপু, যেদিন রংধনু ভেসে ওঠে, সেদিন রোদে-মেঘে লুকোচুরি খেলা চলে। সুঁই দিয়ে যেভাবে পানি বের হয়, সেদিন বৃষ্টিটাও ওভাবেই চলে। রোদ আর মেঘের লুকোচুরির এ দিনে নাকি শেয়ালের বিয়ে হয়।'

শিপু এই গল্প আরো অনেকের কাছেই শুনেছে। তাই এরকম গল্পে তার মোটেও আগ্রহ নেই। এবার সে ভিন্ন প্রশ্ন করে: 'বৈশাবিল আর কতদূরে ভাইয়া?'

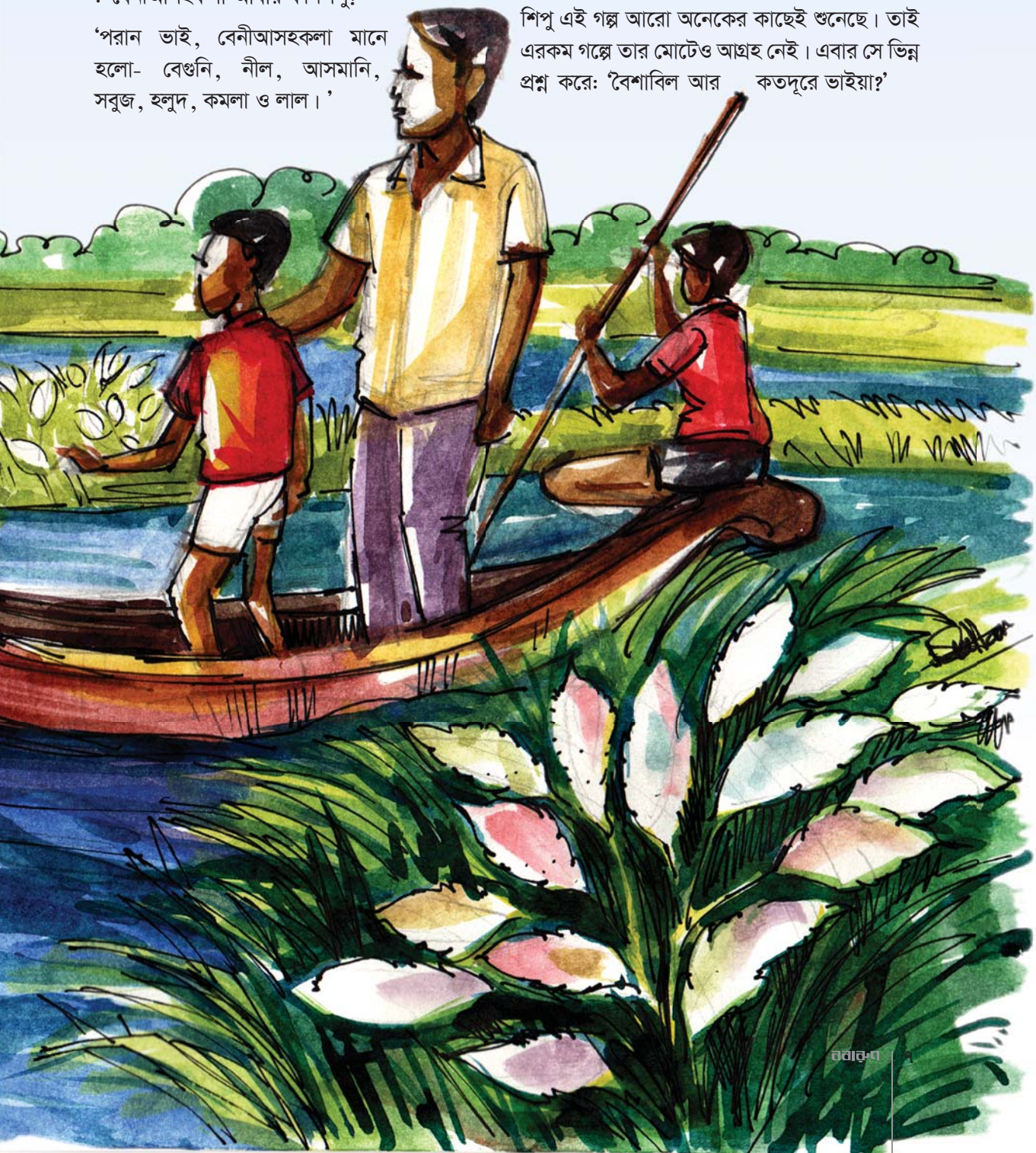

: 'ওই যে পদ্ম, শাপলা, কচুরিপানা আর কলমিলতার জলাশয়টা দেখা যাচ্ছে, ওটাই তো সেই বিল।'

'পরান ভাইয়া, তুমি কি বলতে পারবে, এই বিলটা কীভাবে সৃষ্টি হলো?'

: 'শিপু, মৃগী পাহাড়ি ঝরনাধারা। এটা চলতে চলতে একসময় পাড় ভাঙতে ভাঙতে এঁকেবেঁকে গোল হয়ে যায়। তারপর আবার দুটো বাঁক পানির তোড়ের সোজা ধাক্কায় এক হয়ে যায়, আর পুরনো গোল বাঁকে পানি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে স্রোতহীন এই বদ্ধ জলের খাড়ি ধীরে ধীরে বিলে রূপ নেয়। তারপর বন্যায় পলি জমে এই বিল একসময় খুবই উর্বর হয়ে ওঠে।'

শিপু পরান মাঝির কথায় বেশ আনন্দই পেল। মনে মনে বলল, বিলটা উর্বর বলেই তো এত এত লালসাদা আর গোলাপি রঙের শাপলার কুঁড়ি আর পদ্ম ফুল হয়ে ফোটে। কী চমৎকার বেগুনি রঙের কলমিফুল! লতাই বা কম কীসে? জলের বুকে পদ্মপাতাকে দেখে মনে হয়, কে যেন নরম সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে; কচুরির ফুলও তো অনন্য সুন্দর!'

বৈশাবিল চষে বেড়াতে শিপুর বেশ ভালোই লাগছে।

পরান ভাইকে সে এবার একটা নতুন প্রশ্ন রাখল– 'আচ্ছা পরান ভাই, নদীর এরকম গোলগাল পরিত্যক্ত গতিপথের আর কোনো নাম নেই?'

: 'আমি কি আর এত লেখাপড়া করছি নাকি ভাই? তয় একবার পানি উন্নয়ন অফিসের স্যারদের মুখে একটা নাম শুনেছিলাম, 'অশ্‌শোখুরা রদ' না কী যেন নাম!'

'পরান ভাই, আমারও বেশ মনে পড়েছে। আমি একবার কোথায় যেন পড়েছিলাম। এ ধরনের জলাশয়কে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ বলে।'

শিপু একটু দূরে ব্যস্ত হাঁসের দল দেখতে পেল। হঠাৎ সাঁইসাঁই করে একজোড়া চকাচকিও উড়ে গেল। সামনে এগুতেই ডাহুক, কালিম, সারস, পানকৌড়ি, বকসহ কতরকমের পাখি চোখে পড়ল।

হঠাৎ পরান মাঝি একটা পাখি দেখিয়ে বলল, 'এই শিপু, ওই দেখো কী চমৎকার একটা পাখি! দেখেছ, কী চমৎকার পাখির মাথা-ঘাড়, আর দেহের পালক! এটা নেওচা পাখি'।

শিপু খেয়াল করল, পাখিটার সর্বাঙ্গ

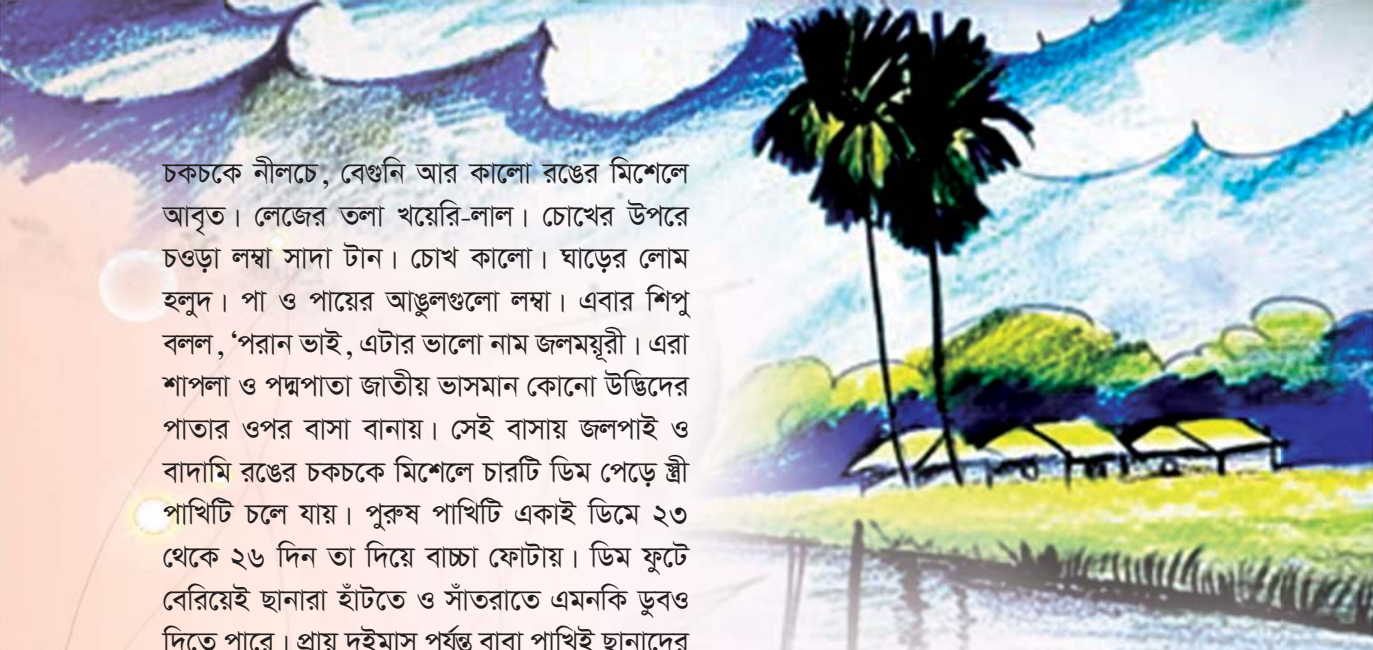

চকচকে নীলচে, বেগুনি আর কালো রঙের মিশেলে আবৃত। লেজের তলা খয়েরি-লাল। চোখের উপরে চওড়া লম্বা সাদা টান। চোখ কালো। ঘাড়ের লোম হলুদ। পা ও পায়ের আঙুলগুলো লম্বা। এবার শিপু বলল, 'পরান ভাই, এটার ভালো নাম জলময়ূরী। এরা শাপলা ও পদ্মপাতা জাতীয় ভাসমান কোনো উদ্ভিদের পাতার ওপর বাসা বানায়। সেই বাসায় জলপাই ও বাদামি রঙের চকচকে মিশেলে চারটি ডিম পেড়ে স্ত্রী পাখিটি চলে যায়। পুরুষ পাখিটি একাই ডিমে ২৩ থেকে ২৬ দিন তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। ডিম ফুটে বেরিয়েই ছানারা হাঁটতে ও সাঁতরাতে এমনকি ডুবও দিতে পারে। প্রায় দুইমাস পর্যন্ত বাবা পাখিই ছানাদের দেখাশোনা করে। জলময়ূরী নেউ, নেউপিপি, পদ্মপিপি বা মেওয়া নামেও পরিচিত।'

বাহারি ফুল আর পাখি দেখে শিপুর মনে বেশ একটা ভাব জমেছে। সে হেসে হেসে মনের অজান্তেই ছড়া আওড়াতে চেষ্টা করছে। করবে না কেন, শরৎ নাকি উদাসী চোখকে কবিতার ছন্দে ভরিয়ে দিতে চায়! সত্যি সত্যিই সে শরৎ ভালোবেসে ফেলেছে।

শিপু দিনান্তে পরান মাঝিকে ময়ূরপঙ্খী ঘুরিয়ে কবিতার দেশে নিয়ে যেতে বলল। এমন সময় ওর কানে মায়ের মধুর কণ্ঠ ভেসে এল– 'এই শিপু, ছুটির পুরোটা দিন এভাবে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলি!'

শিপু মনে মনে হেসে ফেলল। সেই হাসির কিছুটা রেখা ওর ঠোঁটের কোণেও ছড়িয়ে পড়ল। তারপর মনে মনে বলল, 'মা, আজ আমি একটু বেশি ঘুমুলেও আমার স্বপ্নের সারথি ছিল আমারই সুন্দর অনুভূতি। একদিন নিজের যোগ্যতায় এই অনুপম সৌন্দর্যের মুখোমুখি হতে চাই। আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমির সৌন্দর্যকে দু'চোখ মেলে দেখতে চাই।'

শিপুর মা হয়ত ছেলের কথাগুলো শুনতে পাননি, তবে চাওয়ায় যদি জ্ঞানের সাধনা, নিষ্ঠা আর একাগ্রতা থাকে, তাহলে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

শরৎ রানি

এম হাবীবুল্লাহ

পেঁজা তুলো মেঘের সারি
আকাশ জুড়ে ভাসে
শিউলি ফুলের সুবাস নিয়ে
শরৎ রানি আসে।

ঘাসের ডগায় ভোরের শিশির
খিলখিলিয়ে হাসে
নদীর কিনার ভরা থাকে
সাদা সাদা কাশে।

বিলের ধারে শাপলা শালুক
ফোটে রাশি রাশি
তালের পিঠা খায় যে সবাই
মুখে নিয়ে হাসি।

ঋতু রানির সাক্ষাৎ

আবদুল লতিফ

দুই ভাই আরিয়ান এবং আদনান তাদের ছোটো বোন আদিয়া। শহরেই তাদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। গ্রামে তাদের বিশাল বড়ো একটা বাড়ি আছে। গাছগাছালি ভরপুর। কিন্তু দাদা মারা যাওয়ার পর বহু বছর গ্রামের বাড়িতে কেউ ছিল না। ফলে দাদার বসত ঘরটাও বসবাসের অনুপযোগী হয়ে গেছে। আরিয়ানের বাবা তার পাশের বাড়ির এক চাচাকে বাড়িটা দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। আরিয়ানরা কেউ তাদের দাদাকে দেখেনি। দাদি শহরে তাদের সাথেই থাকে।

আরিয়ানের বাবা বছরে দু-তিনবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যায় যেন ছেলে-মেয়েদের অন্তত গ্রাম এবং এর ঐতিহ্য সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে। এই যেমন বাংলা মাসের নাম গ্রামে এলেই কেবল শুনতে পাওয়া যায়। শহরের ছেলে-মেয়েরা বাংলা মাসের নামগুলো কেবলমাত্র পরীক্ষার প্রশ্নে উত্তর দেওয়ার জন্যই পড়ে বলা চলে। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য গ্রীষ্মকাল, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র-আশ্বিন শরৎকাল, কার্তিক-অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল, পৌষ-মাঘ শীতকাল এবং ফাল্গুন-চৈত্র মিলে যে বসন্তকাল এটা হাতে গুণে গুণে মিলিয়ে নিতে হয় তাদের। কিন্তু ইংরেজি মাসের নামগুলো বলার সময় উচ্চারণে ব্রিটিশ ফ্ল্যাভার খুঁজে পাওয়া যায়। এটা অবশ্য অভিভাবকদের কারণেই হয়ে থাকে। অনেকেই সন্তানদের ইংরেজি শেখানোর প্রতি বেশি জোর দিতে গিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোভাবে শেখাতে ভুলে যায়।

আরিয়ানরা এবার গ্রামের বাড়ি গিয়ে অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো অনুভব করেছে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে এবার সবাই অনেক বেশি বিমোহিত। মেঘমুক্ত আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখে দেখে আরিয়ান, আদনান আর আদিয়া ভাবছিল সারা বছর যদি গ্রামেই থাকা যেত- তাহলে কী মজাই না হতো। খুব সকাল সকাল তিন ভাইবোন ঘুম থেকে উঠে বাড়ির চারপাশে পায়চারি করতে থাকে। সেদিন আদিয়া সকালবেলা শিউলি ফুল কুড়িয়ে মালা বানিয়ে দুই ভাইকে উপহার দিয়ে বিস্মিত করেছে। তাছাড়া গাছে গাছে হিমঝুরি, গগনশিরীষ, ছাতিম, পাখিফুল, পান্থপাদপ, বকুল, মিনজিরি, শেফালি, শিউলি, কলিয়েন্দ্রা, কাশফুল ইত্যাদি গ্রামের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এ যেন ফুলেরই রাজ্য।

বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা তিতাসের দুই ধারে সাদা সাদা কাশফুল দেখে সবার চোখ জুড়িয়ে যায়। কবি যথার্থই বলেছেন -

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।

পাশের বিলে ফুটে আছে তারার মতো অসংখ্য শাপলা ফুল। সবুজ ধানের কচি পাতা হাওয়ার দোলায় মন কেড়ে নেয়। তাছাড়া ঘরে ঘরে তালের পিঠার ধুম লেগেছে। বাতাসে ভেসে বেড়ায় পাকা তালের মৌ মৌ গন্ধ। প্রায় প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়েই তালের পিঠায় নাশতা করাটা তাদের কয়েকদিনের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটাও বেশ ভালো লাগে তাদের।

আরিয়ানদের দাদা ভাই (বাবার চাচা যিনি বাড়ি দেখাশোনা করেন) একদিন তিন ভাইবোনকে ছোটো ডিঙি নৌকা দিয়ে ঘুরতে নিয়ে গেলেন। সবাই মিলে শাপলা তুলতে তুলতে নৌকা বোঝাই করে শেষে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ার সময় ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ আরিয়ান পানিতে পড়ে যায়। দাদা ভাই ভাবছে এ আর এমন কী- উঠে যাবে। কিন্তু না আরিয়ান পানিতে ডুবে যাচ্ছে দেখে দাদা ভাই লাফিয়ে পড়ে আরিয়ানকে তুলে আনলেন। আর বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, এত বড়ো ছেলে সাঁতার কাটতে জানে না! এটা কোনো কথা হলো। বাচ্চাদের সাঁতার না শেখাতে পারার কারণে দাদা ভাই আরিয়ানের বাবা-মা কে হালকা করে বকে দিলেন আর বললেন, নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা সাঁতার জানে না এরচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার কি আর গাছে ধরে! বাকি কয়েক দিনে দাদা ভাই আরিয়ান, আদনান এবং আদিয়াকে সাঁতার শিখিয়ে দিয়েছেন। আরিয়ানের বাবা-মা এতে অনেক খুশি হয়েছেন।

দুপুরের খাবার শেষে সব বাচ্চাদের নিয়ে আরিয়ানের বাবা আড্ডায় মেতে উঠলেন। তখন হঠাৎ বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তোমরা যে চারপাশে গাছে গাছে এত সুন্দর সুন্দর ফুল দেখতে পাচ্ছ, তোমরা কী বলতে পারো - বাংলায় এটা কোন মাস এবং কোন ঋতু? সবাই চেষ্টা করল কিন্তু কেউ বলতে পারল না। তখন বাবা বললেন, এখন শরৎকাল। ভাদ্র-আশ্বিন এ দুই মাস মিলে হয় শরৎকাল। এটা বাংলার তৃতীয় ঋতু। স্নিগ্ধ কোমল এই ঋতুকে ঋতু রানি বলে ডাকা হয়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

সাদা মেঘের ভেলা

মো. আনোয়ার কবির

শরতের আকাশ নীলিমায় ভরে
সাদা মেঘ ভাসে রঙিন ভোরে
তুলোর মতো সফেদ যে তারা
নাচে আকাশে দোল খায় সারাবেলা।

শিশুর মনে হাসির খেলা
আকাশ জুড়ে রঙিন মেলা
দূরের বাঁশির সুরে মেশে
মেঘের ছোঁয়ায় মন যায় ভেসে।

নদীর বুকে মেঘের ছায়া
হৃদয়জুড়ে কী যে মায়া।
শরতের ওই সাদা মেঘ উড়ে
যা দেখে হৃদয় মোর যায় ভরে।

শরতের সকাল

মো. আকবর আলী

সোনালি রোদে ঝলমলে ধান
শিশিরে ভিজে শিউলি খান খান
দখিনা বাতাস ছুঁয়ে যায়
সবুজ মাঠে দোল খায়।

পাখিরা গায় মিষ্টি সুরে
সেই সুর ছড়িয়ে যায় সবার ঘরে
নদীর জলে ঝিলমিল হাসি
পদ্ম ফুটে রঙিন বাতাসি।

সাজে প্রকৃতি আপন মনে
সুন্দর রূপ ছড়ায় বনে বনে
শিশুরা খেলে ঘাসের উপর
বৃক্ষের ছায়ায় জোড়া চপল।

গল্প

কাশফুলের হাসি

বেগম শামসুন নাহার

শরতের এক পড়ন্ত বিকেলে নদীর ধারে ফুটে থাকা অসংখ্য কাশফুলের সাথে দোস্তীতে মেতেছিলাম আমরা কজন। লুকোচুরি খেলায় কাশবনে মন মেতেছে, কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়েছে বুঝিনি- হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম মূর্তিমান একজনের ডাকে। পেছনে ফিরে দেখি একজন দাঁড়ানো ঢিলেঢালা ধূসর পাঞ্জাবি পরা চোখে গোল সোনালি ফ্রেমের চশমা আটা, বুক পকেটে সোনালি রঙের ফাউন্টেন পেন গোজা, মুখে স্নিগ্ধ হাসি, অন্তরালে এক বুক ভালোবাসা। বললেন কী হে, কী করছ তোমরা। সন্ধ্যা যে ঘনিয়ে এসেছে বাড়ি ফিরতে হবে না? ভাবলাম তাই তো- বাবুই পাখিরা সারাদিনের ক্লান্তি শেষে কিচিরমিচির ডেকে ফিরছে কুলায়, যেন বলছে তোমরা ফিরে যাও, আমরা এই কাশের বনেতেই রাতে

ঘুমাবো। সূর্যটাও অস্তাচলে- মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে ডুবতে বসেছে দিগন্তে। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মায়ের বকুনি খেতে হবে। এ কথা মনে হতেই কোনো রকমে গায়ের পোশাকের ধূলোবালি, কাশফুলে জড়িয়ে থাকা রেনু ঝাড়তে ঝাড়তে দৌড়ে ফিরলাম বাড়ির পথে। আঙিনায় এসে দেখি চিন্তামগ্ন মা দাঁড়িয়ে সামনে অপেক্ষায়। আমাদেরকে গম্ভীর স্বরে বললেন, দাঁড়াও। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। অন্য কিছু বলার আগেই সেই মূর্তিমান আমাদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। ইশারায় মাকে কী যেন বললেন, মা পথ ছেড়ে দিলেন। বুঝতে পারলাম আমরা আজকের মতো বকুনির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। নিঃশব্দে দৌড়ে কলতলায় গিয়ে কল চেপে হাতমুখ ধুয়ে অতঃপর গৃহে প্রবেশ। কেরোসিনের হারিকেন জ্বালিয়ে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে ঝুপ ঝুপ করে বসে পড়লাম, জোরে জোরে শব্দ করে বই পড়তে শুরু করেছি সবাই। মনে ভয় ছিল, পড়ার সময় পড়তে না বসলে হয়ত কপালে আর একবার শাস্তি জুটবে। পড়ার ফাঁকে একবার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি বাবা বারান্দায় বসে, মা রাগতস্বরে আমাদের নামে নালিশ করছেন-আর বাবা মিটিমিটি হাসছেন। একসময়ে বললেন– জানো, মেয়েরা আমার বড্ড লক্ষ্মী, দেখছ না পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি যদি ওদেরকে শাস্তি দিতে তাহলে হয়ত ওরা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েই পড়ত। ওদের আজকের আনন্দটাই মাটি হয়ে যেত, আর উপভোগ করাটাও ভেস্তে যেত। ভাগ্যিস আমি সময়মতো এসে পড়েছিলাম। তা না হলে তো তুমি এতক্ষণে ওদের পিঠে দু'চার ঘা লাগিয়ে দিতে- কী বলো। মা হেসে বললেন, আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল ওদের দেরি দেখে। খিদেও তো পেয়েছে ওদের, সেই দুপুরে দু'মুঠো করে ভাত খেয়েছে-এখন অবধি কিছু খায়নি। বাবা বললেন-এই না হলে মমতাময়ী মা। আমাদের মাও এমন কথাই বলতেন-আজ তিনি ইহজগতে নেই মনে হলে কষ্ট পাই। যা হোক, তুমি মেয়েদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসো, এদিকে আমরা পড়ছি ঠিকই আবার বাবা-মার কথাও শুনছি চুপিচুপি কান খাড়া করে। খাবারের কথা শুনে পেটটা কেমন চোঁ চোঁ করে উঠল। এতক্ষণে টের পেলাম ক্ষিদে পেয়েছে।

মা বললেন, ওরা এত দেরি করে ফিরবে কেন? আমার চিন্তা হয় না বুঝি। তুমিও তো এমন প্রায়ই দেরি করে ঘরে ফিরো।

সান্ত্বনার স্বরে বাবা বললেন, ভয় পেয়ো না, আমার মেয়েরা অতটা বোকা নয় তুমি যতটা ভাবছ। ওরা আর

ওদের বান্ধবীরা একসাথে মিলে নদীর ধারে খেলায় মেতেছিল, আনন্দও পেয়েছে। তাছাড়া বিকেলের শরতের স্নিগ্ধ আকাশ, প্রাণ জুড়ানো সাদা কাশফুল এটুকুই তো, ছোটাছুটি করেছে- তাতে ওদের শরীর-মন সব ভালো হয়ে গেছে- লেখাপড়াতেও মন দিতে পারবে। খেলাধুলা-ছুটোছুটি এসব করলে শরীর যেমন ভালো থাকে মনটাও ফুরফুরে হয়ে যায়। দেখছ না কেমন জোরে জোরে পড়ছে। তবে শুধু খেয়াল রেখো সন্ধ্যার আগে যেন বাড়ি ফিরে। এবার কিন্তু তোমার উচিত ওদেরকে ডেকে কিছু খাবার মানে এই চিড়েমুড়ি, নাড়ু এগুলো খেতে দেওয়া। ওদেরও তো ক্ষিদে পেয়েছে কী বলো।

এতক্ষণে মা হেসে বললেন, তা তো পেয়েছেই। বাছারা আমার সেই দুপুরে দু'মুঠো করে ভাত খেয়েছে, যাই কিছু খাবার আনি গিয়ে তুমি বরং ওদেরকে ডেকে আনো।

বাবা বললেন আরে যাও, আমারও ক্ষিদে পেয়েছে, তাছাড়া তোমারও তো এ সময়ে খাওয়ার অভ্যেস।

তা কি আর আমি জানিনে। পড়ার ফাঁকে কান খাড়া করে আমরা ওদের কথা শুনছি আর মনে মনে হাসছি- এই তো এখনই খাবার আসবে।

মহাখুশি সবাই তবে ক্ষিদে পেয়েছে মাকে বলার সাহস নেই, বাবা বলে দিয়েছেন-তাতেই খুশি।

মা খাবার এনে বারান্দায় রেখে প্রথম ডাকলেন, কইরে ফেলি, দুলি, ছুটকি তোরা এদিকে আয় তো খাবার খাবি। মা সব সময় আদর করে আমাদেরকে এসব নামেই ডাকতেন। ডাক শুনে এক লাফে পড়া রেখে দৌড়ে চলে গেলাম মা-বাবার কাছে। খেতে খেতে মা জিজ্ঞেস করলেন- আজ তোরা কোন চুলোয় গিয়েছিলিস রে- মা-কে থামিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, আরে ওরা আর কী বলবে। আমি বলছি শোনো- ওরা আজ এক মহা কাণ্ড করেছে। নদীতে সূর্যের ডুবে যাওয়া দেখেছে, নদীর ধারে সাদা সাদা কাশফুল ফুটেছে-সে শোভা দেখেছে-তাদের সাথে মিতালি করেছে, দেখেছে শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, বলাকাদের পাখনা মেলে উড়ে যাওয়া, মাঝ নদীতে মাঝিদের পাল তোলা নৌকা বাওয়া, তরী বেয়ে সারি গেয়ে মনের সুখে হুকোর টান, আবার নদীর কূলে সারি সারি ছই এর নৌকা বাঁধা কত রঙে যে সাজানো-চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। কিছু দূরে বেদে সম্প্রদায়ের ছোটো ছোটো নৌকায় ঘর সংসারও দেখেছে। ওদের কচি মন জুড়ে শুধু প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্বও ঘটেছে বেশ। তুমি দেখে নিও বড়ো হয়েও ওরা এসব কথা ভুলবে না। কাছে থেকে দেখা সব স্মৃতি বড়ো হলে মনে পড়ে, ওদেরও পড়বে। তবে সে সময়ে আর এমন দৃশ্য দেখার সময় পাবে না। তখন সময়ের বড়ো অভাব বোধ করবে। তবে স্মৃতিচারণ তো করতে পারবে, এই তোমাকে আমাকে খুব করে মনে পড়বে ওদের, দেখে নিও তুমি। বাবা খাওয়ার ছলে আরো বললেন- প্রকৃতির কাছ থেকে ওদেরকে দূরে যেতে দিও না। খেলাধূলায়ও বারণ করো না, এতে শরীরের পেশিশক্তি যেমন বাড়ে তেমনি বুদ্ধিমত্তা ও লেখাপড়া ভালো হয়। একসাথে অনেক কিছুই ওদের জানা হয়ে যাবে। খেলার ছলেই শেখা, ভেবেছ একবার। আরও বলি ওরা আমাদের মেয়ে, ওরা কোনো ভুল করতে পারে না, ওদেরকে শুধু দেখে রেখো তুমি। ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তোমার আমার মুখ উজ্জ্বল করবে।

বাবার কথাগুলো মা এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন, তাই যেন হয়। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, আশা পূর্ণ হোক, ওরা বেঁচে থাক, বড়ো হোক, মানুষের মতো মানুষ হোক, আমাদের ছেলে সন্তান হয়নি তো কি হয়েছে ওরাই আমাদের ছেলে-ওরাই মেয়ে।

বাবা-মায়ের সেদিনের কথাগুলো মনে গেথে গিয়েছিল। বড়ো হবো, মানুষ হবো। জানি না কতটুকু পূর্ণতা পেয়েছি তবে মা-বাবার দোয়া, আদর্শকে আকড়ে রেখেছি এ আমাদের সকলের পরম পাওয়া। প্রকৃতিকে ভালোবেসে, প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব করতে পেরে, আমরাও যেন কৃতজ্ঞ চিত্তে অবসর সময়ে সেই সব স্মৃতিচারণ করি-ক্ষণিকের তরে ফিরে যাই সেখানেই। ❑

গল্পকার

অনুবাদ গল্প

ফুলের সেতু

জাফর তালুকদার

অনেক অনেক আগের কথা। স্বর্গ দেবতা বাথালা সভা ডেকেছেন। প্রহরীকে আদেশ দিলেন সভায় ছেলে-মেয়েদের ডেকে আনতে।

স্বর্গ সভায় যোগ দিতে একে একে হাজির হলো মেয়ে তালা, তার উপাধি সকাল তারা। দ্বিতীয় যে মেয়েটি এল তার নাম লিওয়েওয়ে, সে হলো সকাল দেবী। এরপরে হাজির হলো তাগানি, তার পরিচয় ফসল তোলার দেবী। তিন ছেলেও চলে এল একে একে। বায়ু দেবতা হানগিন, বজ্র দেবতা কিদলাত আর সূর্য দেবতা আরৌ।

স্বর্গের বড়ো একটা সভাঘরের গোলটেবিল ঘিরে সভা বসল। ছেলে-মেয়েরা জানত সভাটি গুরুত্বপূর্ণ। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

স্বর্গ দেবতা বাথালা সবার দিকে নজর করে তাকালেন। সহসা চোখে পড়ল একটা আসন খালি। দেবতা উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'বিগাহারি কোথায়? সে আজও সভায় আসেনি!'

প্রহরী বলল, 'আমি সব জায়গায় তাকে খুঁজেছি। কোথাও পাইনি।'

'মনে হয় সে বাগানে খেলছে'। লিওয়েওয়ে মন্তব্য করল।

বাথালা টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন, 'কত বড়ো দুঃসাহস, সে আজও আসেনি!'

কিদলাত বাবাকে শান্ত করে বলল, 'মনে হয় আসতে একটু দেরি হচ্ছে। এসে যাবে।'

বাথালা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'না আর সহ্য করব না। সে এর আগেও বহুবার এরকম করেছে।'

তাগানি করুণ গলায় বলল, 'বাবা, ও তো মাত্র চৌদ্দ বছরের খুকি। হয়ত ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি।'

স্বর্গ দেবতা বাথালা আক্রোশে ফেটে পড়লেন, 'আজকেই ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেবো। ফাজিল মেয়ে কোথাকার!'

ছেলে-মেয়েরা নড়েচড়ে বসে বাবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালো। তাদের ছোট্ট শান্ত বোনটির এ ধরনের কঠিন শাস্তি তারা মেনে নিতে পারছিল না। লক্ষ্মী বোনটি ছিল ফুলের দেবী। ফুলের রকমারি ব্যাপার নিয়ে তার কায়কারবার।

বড়ো বোন তাগানি শেষবারের মতো ঠোঁট কামড়ে বলল, 'বাবা, ওকে আরেকবারের মতো সুযোগ দাও।'

'হ্যাঁ বাবা, দয়া করে একটু বিবেচনা করো। আর ভুল হবে না।' বায়ু দেবতা হানগিন কাতর গলায় বোনের জন্য সুপারিশ করল।

বাথালা পুনরায় গর্জে উঠলেন, 'না, বাগানের খেলাধূলা যখন তার এতই পছন্দ, তখন সারা জীবন ওখানেই থাকুক।'

ফুলদেবী বিগাহারি আপন মনে খেলছিল মর্ত্যের বাগানে। ঝরে পড়া ফুল দিয়ে সে মালা গাঁথছিল। ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে আছে। হলুদ-সাদা ফুলের মালা গলা আর খোঁপায় পরে প্রজাপতির মতো উড়ছিল ফুল থেকে ফুলে।

একটু পরই সন্ধ্যা নেমে এল।

কমলালেবুর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিগাহারির শরীর।

শান্ত সাগর তীরে বসে সে অবাক হয়ে দেখল কমলা রং বদলে কেমন লাল হয়ে গেল। লাল থেকে বেগুনি। বেগুনি থেকে গাঢ় নীল। এরপর কালোর আবরণে ঢাকা পড়ে হারিয়ে গেল লক্ষ হলুদ তারায়।

রঙের জাদু আর ফুলের সুঘ্রাণে বিগাহারি ভুলেই গিয়েছিল তার পাশে অপেক্ষা করছে বাপের পাঠানো দূত।

এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে দূত বলল, 'প্রিয় দেবী, গতকাল থেকে আমি বসে আছি আপনার জন্য।'

বিগাহারি লম্বা শ্বাস টেনে মৃদু চমকে উঠে বলল, 'ভারি আশ্চর্য ! আপনি কী করছেন এখানে?'

দূত কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আপনার বাবা স্বর্গ দেবতা একটা কথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন আমাকে।'

বিগাহারি মিষ্টি হেসে বলল, 'কী কথা শুনি?'

দূত রীতিমতো বিব্রত। সে কী বলবে সহসা ভাষা খুঁজে পেল না। শেষে সংকোচে বলল, 'উনি বলেছেন... বলেছেন... আপনি যেন কখনো বাড়ি ফিরে না যান।'

'কিন্তু কেন, আমি এমন কী করেছি যে জন্য বাবা রাগ করেছেন!' বিগাহারি বিচলিত গলায় বলল।

'জি দেবী, উনি খুব রাগ করেছেন আপনার ওপর।'

'তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু কেন?'

দূত লম্বা শ্বাস টেনে বলল, 'কারণ হলো, আপনি সভায় উপস্থিত ছিলেন না।'

বিগাহারি অবাক হয়ে বলল, 'কীসের সভা! আমি জানি না তো?'

'আজকে দেবতা সভা ডেকেছিলেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। আমি সব জায়গায় খুঁজেও আপনাকে পাইনি।' দূত কাঁপা কাঁপা গলায় অজুহাত তুলে ধরে ফের বলল, 'দুঃখের কথা, আপনি আর কখনো স্বর্গে ফিরে যেতে পারবেন না।'

'কিন্তু আমার অপরাধ কী!' বিগাহারির বাদামি চোখে অশ্রু ছল ছল করে উঠল।

দূত অনুনয়ে ভেঙে পড়ল, 'দুঃখিত দেবী, আপনার তো অনেক বাগান। আমি বহু খুঁজেও ঠিক সময় আপনাকে পাইনি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বার বার শপথ করেও এমনটা করেছি। বাবা এ কারণে রেগে গেছেন আমার ওপর।' বিগাহারি এইটুকু বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'ভালো থাকুন দেবী। আমি এখন যাই।' দূত শেষ কথাটা বলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিগাহারি সূর্য ওঠা পর্যন্ত কেঁদে চোখ ভাসালো। সে ভাবল, বাবার কাছে গিয়ে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে ক্ষান্ত দিল সেই চিন্তায়। বরং মনে মনে স্থির করল, সে এখানের চারপাশের মানুষজন, পশুপাখি আর গাছপালা ভালোবাসবে। এবং হলোও তাই। সে ভালোবাসা দিয়ে এক আনন্দময় জগৎ তৈরি করল। হাজার হাজার নতুন ফুলে রঙের এক আশ্চর্য সুবাসিত ভুবন তৈরি হলো তার চারপাশে। যা কেউ কখনো দেখেনি এর আগে।

দিন যায়।

একদিন বিগাহারি ভাবল, সে সবুজ, লাল, নীল, হলুদ আর কমলা রঙের ফুলের মালা গেঁথে আকাশে এমন এক রঙের জাদু ছড়িয়ে দেবে। যা দেখে বাবা তাকে পুনরায় ডেকে নেবেন কাছে।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। ফুলদেবী বিগাহারি পুনরায় ফিরে গেল স্বর্গের বাড়িতে।

আমরা আকাশে প্রায়ই বিগাহারির সেই বহুবর্ণ রঙে আঁকা ফুলমালা দেখতে পাই। কিন্তু আমরা তার নাম দিয়েছি রংধনু। ❑

প্রাবন্ধিক ও গল্পকার

মন ছুটে যায়

অপু বড়ুয়া

বন ডাকলে মন ছুটে যায় ভাল্লাগে না ঘরে
বনের সবুজ অবুঝ অবুঝ ভাব আনে অন্তরে।
যাই ছুটে ওই লেজ নাচানো কাঠবিড়ালির কাছে
ঝোপের মাঝে হয়ত কোনো পাখির ছানা আছে।

ডাকলে কোথায় টুনটুনিটা, পড়লে ছিঁড়ে পাতা
নেয় উড়িয়ে চপল হাওয়া আমার ছড়ার খাতা।
ছড়ার খাতা কুড়িয়ে নিয়ে যাই ছুটে কাশবনে
পাখনা তুলে হাঁসগুলো বেশ খেলছে আপন মনে।

পলাশ ফুলের লালচে আভা বন করেছে আলো
মন হারানো বনকে আমি বাসি দারুণ ভালো।
শেষ বিকেলের মায়ার আবেশ দেয় ছড়িয়ে আদর
হিজল তরু বিছিয়ে রাখে শুকনো পাতার চাদর।

আদর মায়া ছায়ায় মাখা বনটি আমায় টানে
দুপুরবেলা ঘুঘুর ডাকে আবেগ জাগায় প্রাণে।
বনের আঁধার বনের সবুজ সোহাগ দিয়ে গড়া;
মায়ায় ভরা বন আমাকে নিত্য লেখায় ছড়া।

ভূতোর বন্ধু নিরু মামা

আশরাফ আলী চারু

কদিন থেকে নিরু মামা খুব নীরব হয়ে গেছে। খাওয়া-নাওয়া ভুলে সবসময় ঘরের ভেতর কী যেন করে। ঘরের ভেতর থেকে লক করা থাকে বলে কেউ ঢুকবে এমন সুযোগও নেই। সাকিবের মা যিনি নিরু মামার একমাত্র বোন ও অভিভাবক তার ডাকেও

সে ঘরের দরজা খোলে না। একটু আধটু সাড়া দেয় এর বেশি কিছু নয়। লোকটা ঘরে এত সময় কীভাবে থাকে? ক্ষুধা লাগলে কী খায়? সাকিবরা মামাকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে। যে নিরু মামা গাঁয়ের সকল ভাগিনাকে মাতিয়ে রাখে সেই নিরু মামার নীরবতায় চিন্তিত না হয়ে পারা যায়? কী হলো নিরু মামার?

বাইরে দাঁড়িয়ে সাকিবরা এসব নিয়ে বলাবলি করছিল। হঠাৎ নিরু মামার ঘর থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। উচ্চ শব্দের সেই হাসির আওয়াজ। সেই সাথে কিছু কথাও শোনা গেল। নিরু মামার কথা শুনে সাকিবরা কিছুটা শান্তি অনুভব করল। কিন্তু না, পরের কথাতেই সেই শান্তি উবে গেল।

-আমি বলেছি তো, হা হা, গারো পাহাড়টা তোমার। আর তোমার পাহাড়ে আমি সেনাপতি। সবাইকে দেখে ছাড়ব। কোনো চিন্তা করো না...

সাকিব জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করল। কিছু দেখতে না পেয়ে আরও হকচকিয়ে গেল। সাকিবের বন্ধুরা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

কদিন থেকে নীরব থাকা নিরু মামা আজ কি পাগলের প্রলাপ শুরু করেছে! নাকি ভূতের আছড় পড়ল মামার উপর? সাকিবের এমন ভাবনা শেষ না হতেই নিরু মামা বলে উঠল - সাকিব, তোর ভূত নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। তোর কাজ তুই কর। তোরা স্কুলে যাবি যা। এখানে কাউকে যেন আর না দেখি। কারুর ফিসফাস যেন না শুনি। তোরা কেউ আমি আর আমার ভূতো বন্ধুর পিছনে লাগতে আসিস না। তাইলে কিন্তু তোদের পরিণাম...

ওরে বা বা রে বলে পড়িমরি করে সাকিবের বন্ধুরা দৌড় দিল। এক দৌড়ে তারা স্কুলে চলে গেল। সাকিব গেল না। সে ভাবতে লাগল মামা তার মনের কথা জানল কেমন করে! যখনই ভূতের কথা মনে মনে ভাবলাম তখনই মামা কতসব কথা বলে ফেলল! সত্যিই মামাকে ভূতে ধরেছে। মাকে বিষয়টি বলতে হবে। ভয়ে গুটিসুটি মেরে মাকে ডাকতে লাগল সাকিব। মা, মা নিরু মামাকে নিশ্চিত ভূ উ উ তে ধ রে ছে, এই বলে কোনোমতে ঢুক গিলল সাকিব। সাকিবের মা সারা বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল। হ্যাঁ গো এখন কী হবে গো। আমার একমাত্র ভাই। মা মরা ভাই, এতিম ভাই, এখন কী হবে গো বলে গড়াগড়ি করে কাঁদতে লাগল।

গত দুই সপ্তাহে গাঁয়ের সবাই জেনে গেছে নিরু মামাকে ভূতে ধরেছে। আধা ডজন ভূত ছাড়ানোর ওঝা এসে ভূত ছাড়াতে ফেল মেরেছে। কারোর দ্বারাই এত বড়ো ভূত ছাড়ানো সম্ভব হয়নি। আজ একজন ওঝা চ্যালেঞ্জ করে এসে বলল- পৃথিবীর যত নিকৃষ্ট ভূতই হোক, যত শক্তিশালী ভূতই হোক আজ তিনি ছাড়িয়ে দেখাবেন।

রাতে সারা গাঁয়ের লোক উঠানে জড়ো হলো। উত্তরমুখো হয়ে ওঝা বসলেন। এই গরমে চাদর গায়ে দিয়ে নিরু মামা এসে বসল দক্ষিণমুখো হয়ে। নিরু মামাকে এখানে আসার জন্য কারুর সাহায্য নিতে হলো না। তাকে একাকি এসে বসতে দেখে উপস্থিত লোকজন ওঝার কারিশমা আছে বলে আলোচনা করল।

এবার নিরু মামা মুখ খুলল- বলো ওঝা কী জানতে চাও?

-আমার রোগীটাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে খুব ভালো মানুষ। আজ তিন সপ্তাহ থেকে সে তোকে নিয়ে কাটাচ্ছে। কত ওঝা এল-গেল তবু ছাড়লি না। আজ তোকে চলে যেতে হবে। নতুবা তোকে বোতলে বন্দি করে রাখব।

-হা হা হা হা হা। হাসিতে সারা উঠান মাতিয়ে তুলল নিরু মামা। ওঝা সাহেব, আমাকে ভূতে ধরেছে? গত এক সপ্তাহ থেকে আমার বোনটার কাছ থেকে তোমরা ফাও টাকা নিচ্ছ। ভূতে ধরে তাই না? পাজির দল আজ তোকে এমন শিক্ষা দিব যেন জীবনে এই জোচ্চুরি কাজ না করিস। বলে নিরু মামা কিল-ঘুষি দিয়ে ওঝাকে দৌড়ানি

দিল। উপস্থিত লোকজন ভয় পেয়ে গেল। তাদের ধারণা হলো নিরুকে সত্যিই বড়ো ভূতে ধরেছে। আরও বেশি জানাশোনা ওঝা আনতে হবে। এবার নিরু মামা সবাইকে তাক লাগিয়ে বলতে লাগল- শুনেন, সপ্তাহ তিনেক আগে আমি গারো পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে একটা ময়নার ছানা কুড়িয়ে পেয়েছি। এত ছোটো ছিল যে তার লোম গজায়নি। দেখতে ভূতের ছানার মতো লাগছিল বলে ভূতো নাম দিয়ে তাকে এই

কয়দিন ধরে ঘরে থেকে লালনপালন করে বড়ো করলাম। সে এখন কথা বলার জন্য কান পেতে শুনে।

এবার সাকিব বলল- তবে ঘর ভেতর থেকে লক করে রাখতে কেন? আর এই কয়দিনই বা এই কথা বলোনি কেন?

-যদি বলতাম, তোদের অত্যচারে পাখিটিকে মানুষ করতে পারতাম? তোরা তো আউলাঝাউলা করে দিতি। কান পেতে শোন, আমি ডাক দিলে সে চিঁচিঁ করে কথা বলবে। বলে সে ভূতো বলে ডাক দিতেই ঘর থেকে চিঁচিঁ আওয়াজ এল। সবাই শুনল।

-তুমি তবে কেন বলেছিলে গারো পাহাড়ের সেনাপতি তুমি?

-আরে গাধা, ছানাটিকে বুঝ দেওয়ার জন্য। আরেকটু বড়ো হলে তাকে পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে আমি সেনাপতিগিরি করব যাতে তার কোনো ক্ষতি না হয়।

-আমি মনে মনে ভূত ভাবার সময় তুমি কেমনে বললে যে ভূতের কথা যেন আমি না ভাবি।

-আমি জানি ওরকম পরিস্থিতির সময় সবাই ভূতে ধরার ভাবনায় মশগুল থাকে। আমি এজন্যই বলেছিলাম। তাছাড়া ওই কথা না বললে তোরা কেউ আমার ঘরের আঙিনা ছাড়তি না।

-তুমি এই কয়দিন ঘরে আবদ্ধ থেকে খেলে কী?

-আরে বোকা, চিড়ামুড়ি। ঘরের ভেতর যখন সব সুবিধা থাকে তখন বের না হলেই কী।

এরপর উপস্থিত সবাইকে নিরু মামা বলল- ভূতের বন্ধু তোমাদের এই নিরু মামা। তাকে ভূতে ধরবে এমন ভূত দুনিয়াতে আছে না-কি!

নিরু মামার কথা শুনে সবাই আশ্বস্ত হলো যে নিরু মামাকে আসলেই ভূতে ধরেনি। এরপর সবাই যার যার বাড়িতে চলে গেল। ❑

শিশুসাহিত্যিক

শরতের পড়ন্ত বিকেল

সুজিত হালদার

অবশেষে তোমাকে দেখেছি
শরৎ মেঘের চাদর মোড়ানো পথে
যে পথে শিশির সিক্ত হয়েছে শুভ্র কাশের ফুল
ধূসর রঙের ঘুঘু উর্বরতার সোনালি ফসলের দেশ
গোধূলির আকাশে হিমেল চাঁদ উঠা বাংলাদেশ।
তোমাকে দেখেছি ঝরা শেফালির গন্ধে
ঘন ঘন বৃষ্টিস্নাত মায়াবী পৃথিবীর রোদেলা পথে
মধু পিয়াসী ভ্রমরের গুঞ্জনে সে কী যে আবেশ
সন্ধ্যা-ভোরের জোয়ার-ভাটার গতি পালটানো দেশ
নীলাভ ঋতু-বৈচিত্রের সব সম্ভবের সবুজ
বাংলাদেশ।
অবশেষে তোমাকে দেখেছি
কোনো এক পেঁজা তুলোর মেঘের স্তূপে
রং কুড়ানো শরতের পড়ন্ত বিকেলের হাসির রেশ
নিঃসঙ্গের বিস্ময় ছায়াসঙ্গী প্রিয় আমার বাংলাদেশ।

ছড়ার হাটে

জিহাদুল আলম

প্রজাপতি দিলো চিঠি
কুমড়ো ফুলের খামে
নেমন্তন্নের সেই চিঠিটা
আসলো আমার নামে।

ছড়ার হাটে জমবে যে আজ
ফুল-পাখিদের মেলা
হরেক রকম আসবে পাখি
করবে মজার খেলা।

প্রজাপতি পাঠালো যে
ঝলমলে এক নাও
ফড়িংছানা এসে বলে
জলদি করে যাও।

নায়ের মাঝি নামিয়ে দিলো
ছড়া নদীর ঘাটে
আজকে শুধুই ফুর্তি হবে
মজার ছড়ার হাটে।

মরীচিকা

নাসরীন খান

অসৎ, লোভ আর অহংকার
এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যার
ধ্বংস হবে সে তিলে তিলে।
নিঃসঙ্গও হবে অচিরেই
বিবেকবোধ অন্ধ তাই
ভালো মন্দের পার্থক্য নাই,
মানুষ নামের খোলসধারী
অথচ পৈশাচিক আচরণ।

পরিশ্রম আর সততায়ই শান্তি
মুক্তিও মিলে লোভের,
একদিনে কেউ হয় না বড়োলোক
তিল তিল করে শ্রম দিয়ে...
তবেই উঠে সিঁড়ি ডিঙ্গে উপরে
আর তখন সার্থক তোমার
মানব জনম।

ভূতের গল্প

চন্দনের দুই রাত

মাশ্‌হুদা মাধবী

ট্রেন লেট থাকায় পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গ্রামের স্টেশনে মিটমিট আলো নিয়ে নিরিবিলি দাঁড়িয়ে যেন তাদেরই অপেক্ষায়। ছোটো স্টেশনটিতে তাই তারাই শুধু অতিথি, রীতিমতো ভিআইপি। প্ল্যাটফর্মে চন্দন বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, শক্ত করে হাতও চেপে ধরেছে। নতুন জায়গা, মা সাবধানে থাকতে বলেছেন। মা আর ভাইয়া এবার আসতে পারল না। কারণ মায়ের কলেজের অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ফরম ফিলাপের দায়িত্ব আছে। এছাড়াও ভাইয়ার কলেজে ফিজিক্স, ম্যাথের ক্লাস টেস্টও রয়েছে।

স্টেশন থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে চন্দন দেখে বিস্তীর্ণ এক জলাভূমির ঠিক মধ্যখানে পানিতে আগুন জ্বলছে। চন্দনের প্রশ্ন, বাবা, ওখানে পানির উপরে কীসের আগুন? আমি অবাক হচ্ছি বাবা, পানিতে কী করে আগুন জ্বলে? কিন্তু বাবা হেসে উত্তর দেন হুমম, এখন না, পরে শুনিস। তাদের রিকশাটা আস্তে আস্তে

চলছে, রিকশাটা সেজো দাদা স্টেশনে পাঠিয়েছেন। কিছু পরেই নিরালা রাস্তা, রাতের অন্ধকার আকাশে একটা ছোটো আলোর পাখি উড়তে দেখে চন্দন ভয়ে কুঁকড়ে যায়, কী দেখছে সে! আলোর পাখি মানে ওটা কী! এই সময় গল্পে পড়া ও শোনা জ্বিন, পরি, ভূত প্রেতের কথা মনে হয়ে ভয় করে চন্দনের। আলোর পাখিটা দ্রুতই মিলিয়ে যাওয়ায় বাবাকে দেখানো গেল না।

এইভাবে বেশ ভয় ও আতঙ্ক অনুভূতির মধ্যে তারা বাড়িতে পৌঁছে যায়। রাতের অন্ধকারে অচেনা জায়গায় চন্দনের মন খারাপ, কিছুটা চিন্তাও। কিন্তু সে বুঝতে দেয় না কাউকে।

বাবার সেজো চাচা-চাচি পথ চেয়ে বসেছিলেন। সেলফোনে কয়েকবার কথাও হয়েছে, কেন দেরি হচ্ছে ইত্যাদি। বাড়িতে দুজনই থাকেন শুধু। তাদের ছেলে-মেয়েরা ইউরোপ, আমেরিকায়। চন্দনদের জন্য সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে রেখেছেন দাদি, টুকটাক কাজের সহকারী সাজুকে নিয়ে। সে অবশ্য সকালবেলা স্কুলেও যায়। ক্লাস সিক্সে পড়ে।

দাদার ছিমছাম ছোটো বাড়িটা চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের। টালির ছাদ দেওয়া লম্বা টানা বারান্দা। চিলেকোঠার মতো দুটি রুম উপরে। গল্পে পড়া বিদেশের কটেজগুলোর মতোন। এইবার পথের ক্লান্তি, ভয় ভুলে বেশ খুশিই চন্দন, ওয়াও, কী দারুণ বাড়িটা সেজো দাদার। গ্রামে এই বাড়িতে তাদের প্রথম আসা। সরকারি কলেজের জনপ্রিয় গুণী প্রফেসর সেজো দাদা রিটায়ার্ড করে বাবা দাদার জন্মভূমিতে থাকছেন প্রায় সাত আট বছর হলো। অনেকবার তাদের বেড়িয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেও আগে আসার সুযোগ বা সময় হয়নি। নানান ব্যস্ততা ভরপুর জীবন। এবারও যেমন মা, ভাইয়া আসতেই পারল না। অল্পদিনের মধ্যে সেজো দাদা, দাদি তাদের প্রবাসী ছেলে-মেয়েদের কাছে বেশ কিছু দিন থাকতে যাবেন বলে আসতে হলো এখনই। না হলে দাদা-দাদি মন খারাপ করতেন।

সেজো দাদি কত রকম খাবারের আয়োজন করেছেন। খেতে ইচ্ছা করছে দেখেই। তাদের পছন্দের অনেক আইটেমই বানিয়েছেন দাদি সাজুর মাকে সঙ্গে নিয়ে। সাজুর বাবা সেজো দাদার দেওয়া রিকশা চালায়। আর সাজুর মা দাদির সঙ্গে বাড়ির নানা ধরনের কাজের দায়িত্বে। রাতে নিজেদের বাড়িতে চলে গেলেও সাজু সেজো দাদাদের এখানেই ঘুমায়।

রাতের খাবার রেডি। ফ্রেশ হয়ে তারা খেতে বসে যায়। অন্যদিন দাদা-দাদি রাত আটটার মধ্যে ডিনার শেষ করলেও আজ সামান্য দেরি, তাদের জন্য অপেক্ষায়। পাকা টমেটো, নতুন আলু দিয়ে, নদীর বোয়াল মাছ, বাগানের জাংলার শীম, ছোটো ছোটো আলু, রাঁধুনি পাতা দিয়ে বড়োসড়ো পুঁটি মাছের চচ্চড়ি, গাছের কচি লাউ দিয়ে তাজা শোল মাছের তরকারি। সব দারুণ স্বাদের খাবার। আরও কত কিছু রান্না করেছে দাদি। দাদা বললেন, বেশি করে খাও। সব কিন্তু অর্গানিক দাদু ভাই। চন্দন বলে, বাহ্, দারুণ ব্যাপার দাদা।

খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আবার ডেজার্টের ভর্তি প্লেট এল। খেজুর গুড়ের সুগন্ধি পাটিসাপটা যার ভেতরে খেজুরের গুড় দিয়ে নারকেলের হালুয়ার পুর ঠাসা। এতই স্বাদ। মজায় মজায় চন্দন তিনটা খেয়ে নিলো। গরুর খাঁটি ঘন দুধ দিয়ে সুগন্ধি দার্জিলিং চা। মা আর ভাইয়া এলে দারুণ জমত। মিস করে চন্দন। কয়েকবার ভিডিও কলে বলেছে ওরে আফসোসের কথা।

রাতে তাদের শোবার ব্যবস্থা উপরে ছাদের ঘর চিলেকোঠায়। ছিমছাম ঘরে পরিষ্কার বিছানায় তুলতুলে লেপের ভেতর ঢুকে সে বাবাকে পথে দেখা আগুনের কথা জিজ্ঞেস করে আবার। বাবা হালকা গলায় বললেন, ওটাকে গ্রামের মানুষ বলে আলেয়ার আলো। এটা ভয়ের কিছু নয় আসলে। সায়েন্টিফিক ব্যাপার আছে। তুমি বড়ো হলে জানবে আরো। ভয় নেই শুনেও ছোটো মানুষ চন্দনের ভয় করে। আলোর পাখি দেখেছে জানালে বাবা বলেন- ও কিছু নয়, তোমার দেখার ভুলও হতে পারে আব্বু। এখন ঘুমাও তো। কিন্তু চন্দনের মনে হয় আসল ব্যাপারটা বাবা গোপন করছে। তাকে জানাতে চায় না।

দশ বছরের চন্দন ভয় কমাতে লেপের ভেতরে ঢুকে গেছে তখন। অবশ্য শীত অনেক। গুগল বলছে তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস, ফিল লাইক বারো।

বাবা ছেলে গভীর ঘুমে। কিন্তু মাঝ রাতে চন্দনের ঘুম

ভেঙে গেছে কুকুরের কান্নায়। একই সঙ্গে ঘরের ছাদে ধুপধাপ শব্দ। চন্দন ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। হাবিজাবি ভয়ের স্বপ্ন, রাতের আকাশ ভর্তি অসংখ্য আলো দিয়ে তৈরি পাখি উড়ছে। একটা বড়োসড়ো পাখি জোর করে তাকে পিঠে বসিয়ে উড়াল দিচ্ছে।

আর এখন এইসব বিচিত্র শব্দে ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। ওরে ব্যস! ছাদের উপরে আবার কে যেন চলাফেরা করছে মনে হয়? এরপর অনবরত ঢিল পড়ার শব্দ। সে ভয়ে বাবার কোল ঘেঁষে শোয়। বাবা ঘুমে বিভোর হলেও চন্দনের সহসা ঘুম আসে না।

পরেরদিন ঘুরাঘুরি, সকালে এক দফা। বিকেলে আরেক দফা। গ্রামের পৌষ মেলা দেখা হলো।

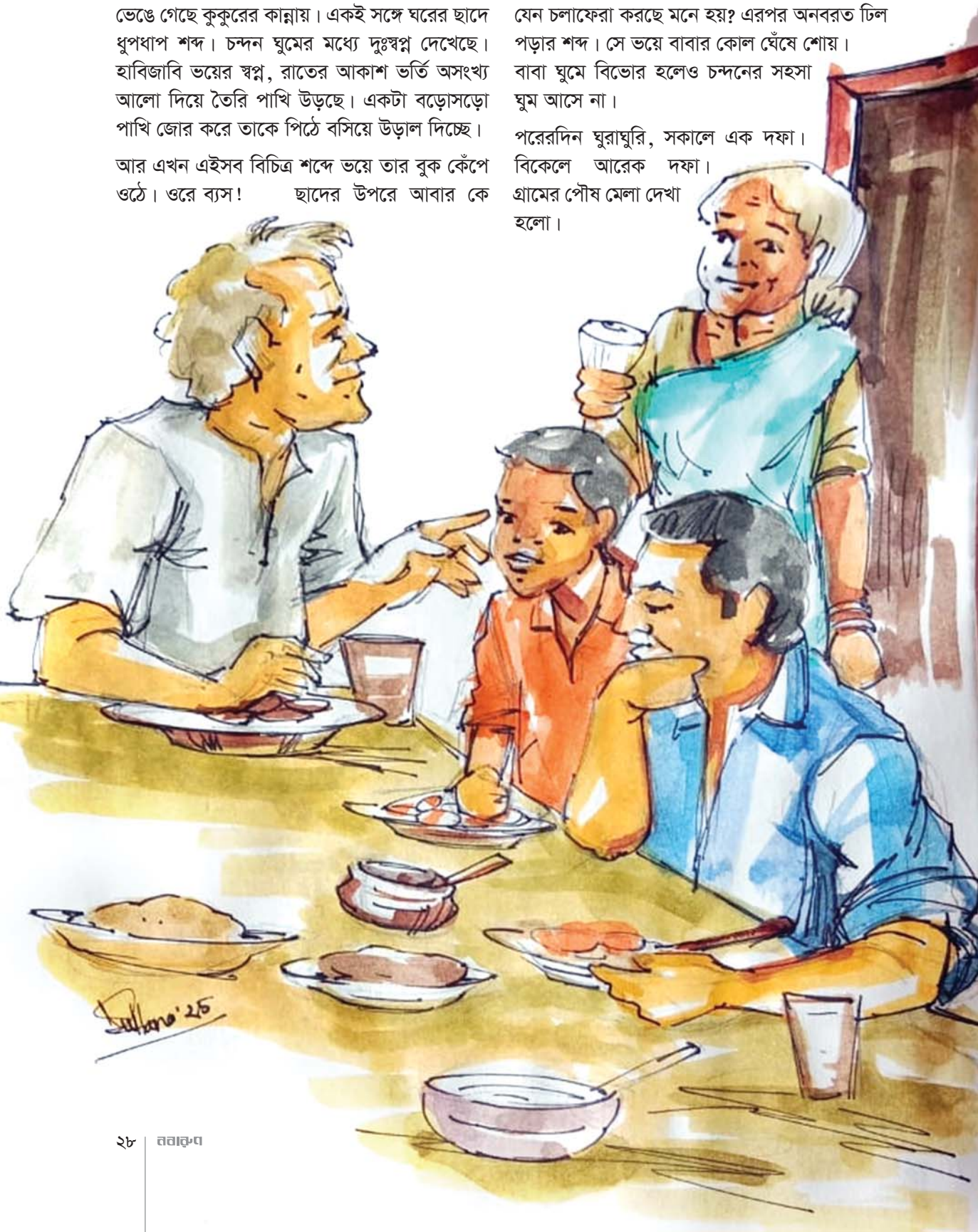

মুড়কি, বাতাসা, কদমা, তিলের খাজা, গজা কেনা ইত্যাদিতে বেলা বয়ে যায়। এরপর বাবা হাটে গিয়ে তাজা বোয়াল, চিতল, আইড়, কৈ আর পাঁচমিশালি মাছ কিনলো সাধ মিটিয়ে। সাজু জোর করে তার হাতে মাছের ব্যাগটা নিয়েই ছেড়েছে। এভাবে অমাবস্যার গাঢ় সন্ধ্যা নামলো। এখন অমাবস্যার অন্ধকারে গ্রামের মিটমিটে বিদ্যুৎ আলো পথকে তেমন আলোকিত করতে পারেনি। হঠাৎ তারা দেখে সাজু নেই। বাবার ডাকাডাকিতে অল্প পরে পাশের বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে এল হতবিহ্বল সাজু। বাবা বেশ একটু চিন্তিত, কী হয়েছে সাজু? গেসিলা কই? সাজু বলল বাঁশঝাড় থেকে অল্প ভেতরে জলাভূমির দিকে একটা ছায়ামূর্তি তাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছিল! বাবার ডাকে তার ঘোর কেটে গেলে পেছনে দৌড় দেয়। আর কিছুই বলতে পারে না সাজু। কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। ভয় পাওয়া মুখ। সাংঘাতিক রহস্যময় ব্যাপার। এবার সাজুর হাতও ধরে রাখে বাবা। আহা, সাজুও তো তেমন বড়ো না।

বাড়িতে এসে এই ঘটনা জানালে নূরী দাদি তাদের সবাইকে কাছে বসিয়ে দোয়া দরুদ পড়ে ফুঁ দিয়ে বললেন, যাক, আল্লাহর রহম যে বড়ো বিপদ হয়নি। এইসব পথে ভর সন্ধ্যায় চলাফেরা করতে নেই। শহরে থাকো, এইসব অজানাই। সন্ধ্যায় মাছ কিনতে যাবে জানলে নিষেধ করতাম বা নিজেদের রিকশাটা পাঠাতাম। দাদা বললেন, চেনা মাছওয়ালাকে ফোন দিলে বাড়িতে তাজা মাছ দিয়ে যেত। বাবা বলে, সে-ই। ভুল হয়ে গেছে চাচ্চু। আমি ভাবলাম চন্দন নিজে গ্রামের হাট দেখুক তা-ই আরকি!

রাতে ক'টা কই মাছ সকলে একসঙ্গে খাবে বলায় দাদি রান্না করলেও বাকি মাছ সাজুর মা কুটে বেছে সযত্নে ডিপ ফ্রিজে রাখে।

দাদির রান্না বড়ো বড়ো দেশি কই মাছ ফুলকপি, আলু, পাকা টমেটো দিয়ে খেতে যেন অমৃত। এছাড়া আছে গোল লাল আলু, মটরশুঁটি দিয়ে দেশি মুরগির ঘন ঝোল। চন্দন বেশি কাঁটার মাছ খেতে চায়না, কিন্তু আজ সেও গোশ্ত থাকা সত্ত্বেও কই মাছ খেয়ে বলল, কত্ত মজা খেতে। দাদির অনুরোধে সে বেগুন, টমেটোর ভর্তাও মুখে দিয়েছে। আর চ্যাপা শুটকি ভর্তা বাবা খুব পছন্দ করে খেলেও সে খায়নি। কাল ভোরের ট্রেনে ফিরবে তারা। তা-ই তাড়াতাড়ি চিলেকোঠার ঘরে বিছানায়, সারাদিন বিস্তর ঘুরাঘুরি হয়েছে, ক্লান্ত চন্দন ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝরাতে আবারও সেই ধুপধাপ, এরপর ঢিল পড়ার শব্দ। একই সঙ্গে কাছেই কোনো রাতজাগা অচেনা নিশাচর পাখির অদ্ভুত ডাক গভীর রাতকে করে তুলল ভয়ার্ত। বাবার হাইপ্রেসার, তার ঘুম ভাঙাতে চায় না চন্দন। কিন্তু ভয়ে নিজের হাত-পা হিম ঠান্ডা হয়ে গেছে। প্রায় বিশ, পঁচিশ মিনিট একটানা এইসব ধুপধাপ চলল। বাব্বাহ, কাজ নেই, রাতের শেয়ালও ডাকে তখন, হুক্কাহুয়া হুক্কাহুয়া। আবার প্যাঁচাও ডাকছে! কী মুশকিল, কত কিছু হচ্ছে একসাথে। একটা সময় গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় চন্দন। স্বপ্ন দেখল জ্যাক এন্ড দ্য বীন স্টক গল্পের সেই লম্বা চওড়া ভয়ঙ্কর দৈত্যকে।

বাবার ডাকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল চন্দন। বাইরে ভোরের ফুটিফুটি আলো। ওহ, তাই তো, আজকে সকালের ট্রেনে তো তাদের ফিরতে হবে। দ্রুত রেডি হয়ে নিচে এল তারা। গরম ভাপা পিঠা এই ভোরে বানানো শেষ দাদির। রাতে তৈরি নলেন গুড়ের পায়েস, চালের আটার তখনই সেঁকা তুলতুলে নরম সাদা ধবধবে রুটি নিয়ে এল সাজুর মা। খেতে খেতে চন্দনের ইচ্ছা করে গত দুই রাতের ভয়ের ঘটনা শেয়ার করতে। কিন্তু সেই সময় তো হাতে নেই। তাছাড়া সকলে হয়ত বিশ্বাসও করবে না।

সাজুর বাবাও রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাই সব কথা মনের ভেতরে রেখে আবারও এখানে আসবে জানিয়ে চন্দন বাবার সাথে রিকশায় উঠে বসে। গত দুই রাতের না বলা সব কাহিনি মনের ভেতরে নিয়ে চন্দন দাদা-দাদিকে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই দেয়। তার আসলে এইসব কথা কাউকেই বলা হবে না। মা শুনলে ভাববে সে ঠিক স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে। বাবা বলবে ভুল দেখেছে। আর বিজ্ঞ ভাইয়া তাকে ভীতুর ডিম বলে হেসে মজা করবে। তার কোনোটাই পছন্দ হবে না। এরচেয়ে কাউকে না বলাই ঢের ঢের ভালো। ❑

গল্পকার

আত্মকাহিনি

আমি Kjvi খোসা

রকিবুল ইসলাম

আমি একটি খোসা। সাগর কলার খোসা। এইমাত্র একটি ছেলে আমাকে ছুড়ে ফেলল। আমাকে ছিলে ভেতরের সুন্দর কলাটা খেয়ে ফেলে দিল। তাও আবার রাস্তার মাঝখানে! অনেক ব্যথা পেয়েছি। এমনিতেই ছিলার সময় যা ব্যথা পেয়েছি তা আর বলার নয়। চার ভাগে ভাগ করে টেনে টেনে ছিলেছে। তারপর পাকা রাস্তার ওপর এমনভাবে ছুড়ে মারল! উফ...

ব্যথায় আমার ভাগ হওয়া শরীরটা একদম নেতিয়ে পড়ল। ফেলবি তো রাস্তার বাইরেই ফেল। তা না একদম রাস্তার মাঝখানে! এখন যদি কিছু একটা হয়ে যায়! ওমা একি, ওই তো একটা গাড়ি আসছে! তিন চাকার অটোরিকশা। আমি এবার শেষ! বাঁচার আশা যেটুকু ছিল তাও অবশিষ্ট থাকে না! ভূ...উ...ভূ...উ.. করতে করতে গাড়িটা কীভাবে যে চলে গেল, বুঝতেও পারলাম না।

যাক মনকে শক্ত করার চেষ্টা করলাম। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে বাঁচার চেষ্টা করে যেতে হবে। সহজেই হার মানা ঠিক হবে না। এমন সময় আবারও পপ পপ শব্দ শুনতে পেলাম। একটা দানব ছুটে আসতে দেখা যাচ্ছে। ইয়া বড়ো একটা ট্রাক। এদিকেই আসছে। মনে হচ্ছে আমাকে মারার জন্যই সে রাস্তায় নেমেছে। শ শ গতিতে ছুটে আসছে। এখন তাহলে কী হবে! পাকা রাস্তার সঙ্গে একদম পিষে ছাড়বে তো! কে কোথায় আছো, বাঁচাও।

রাস্তার পাশ দিয়ে দুই একজন মানুষও যাচ্ছে। কিন্তু আমার চিৎকার কেউ শুনল না। ট্রাকটা এগিয়ে আসছে দানবের মতো। আর একটু পরেই আমি মিশে যাব পাকা রাস্তার পাথরের সঙ্গে!

ট্রাকটা মহা গর্জন করে বেরিয়ে গেল। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকলাম। একটু পর চোখ খুলে আমি নিজেই অবাক। এ কী দেখছি আমি! আমার তো দেখছি কিছুই হয়নি! বুঝলাম রাস্তার মাঝখানে থাকায় এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

একটি কুকুর ম্যারাথন দৌড়ের মতো যাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে থামল। তারপর এদিকে ওদিকে মাথা ঘুরালো। কাউকে না দেখে আমার কাছে এগিয়ে এল। মুখটা নামিয়ে আনল আমার একদম কাছাকাছি। কী বিচ্ছিরি গন্ধ রে বাবা! নাক দিয়ে টেনে টেনে শুঁকল কয়েকবার। আমি তো ভয়ে চুপসে গেলাম। যে ছুঁচালো দাঁত ওর! একবার কামড় বসালেই জীবন বের হয়ে যাবে! কুকুরটা কী মনে করে চলে গেল। যাওয়ার সময় পা দিয়ে আঁচড় বসিয়ে দিল। ওরে কী পায়ের নখ! কোনোদিন নখ কেটেছে বলে মনে হয় না!

রাস্তাটা তেমন ব্যস্ত রাস্তা না। দূরের তিন চারটা গ্রামকে ইউনিয়ন পরিষদের মূল সড়কের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। তাই গাড়ি চলাচল তেমন নেই বললেই চলে। মোটর সাইকেলের যাতায়াত বেশি। দুই একটা অটোরিকশা যাচ্ছে। আর পায়ে হাঁটা মানুষের যাতায়াত। রাস্তার দুইপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত। নির্মল বাতাসের একটা আবাসক্ষেত্রও বলা যায়।

এই যে মানুষ ভাই, আমাকে বাঁচাও। রাস্তা থেকে সরিয়ে নাও। দানব গাড়িগুলো আমাকে শেষ করে দেবে। ও ভাই, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?

মনে হলো আমার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। শুনলে কেউ না কেউ সরিয়ে দিত! শুনেছি মানুষ খুব দয়ালু। আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখলে অবশ্যই সরিয়ে দিত।

আমার ভয় শুধু আমাকে নিয়ে না। ভয় বেশি হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। যেভাবে শৎ শৎ করে মোটর সাইকেল যাচ্ছে তাতে যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমার শরীরে চাকা উঠলেই চিৎপটাং হতে হবে মানুষকে। বাঁচার সুযোগ থাকবে বলেও মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া মানুষ কেউ না দেখে আমার শরীরে পা দিলেই পিছলে পড়বে। হাত-পা ভাঙতে পারে। না হলেও ব্যথা তো পাবেই! আমি না হয় পিষে গেলাম। কিন্তু মানুষের কী হবে!

আরো একটি গাড়ি পাশ কেটে চলে গেল! আরো একটি... এভাবে গাড়ি যাওয়া বাড়তেই লাগল। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল। আমার ভয়ও বাড়তে থাকল। অন্ধকারে নিশ্চিত কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে। তার আগেই যদি কেউ এসে আমাকে সরিয়ে দিত! রাস্তার পাশের জঙ্গলে থাকলেও কিছু সময় নিশ্চিন্তে থাকা যেত!

কেউ কি শুনছ, মানুষ ভাই। আমাকে একটু সরিয়ে দাও। রাস্তার পাশের জঙ্গলে রেখে দাও। মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচাও!

কেউ-ই আমার কথা শুনল না। বরং হাসতে হাসতে কিংবা গল্প করতে করতে মানুষগুলো গন্তব্যের দিকে চলে যাচ্ছে। আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না।

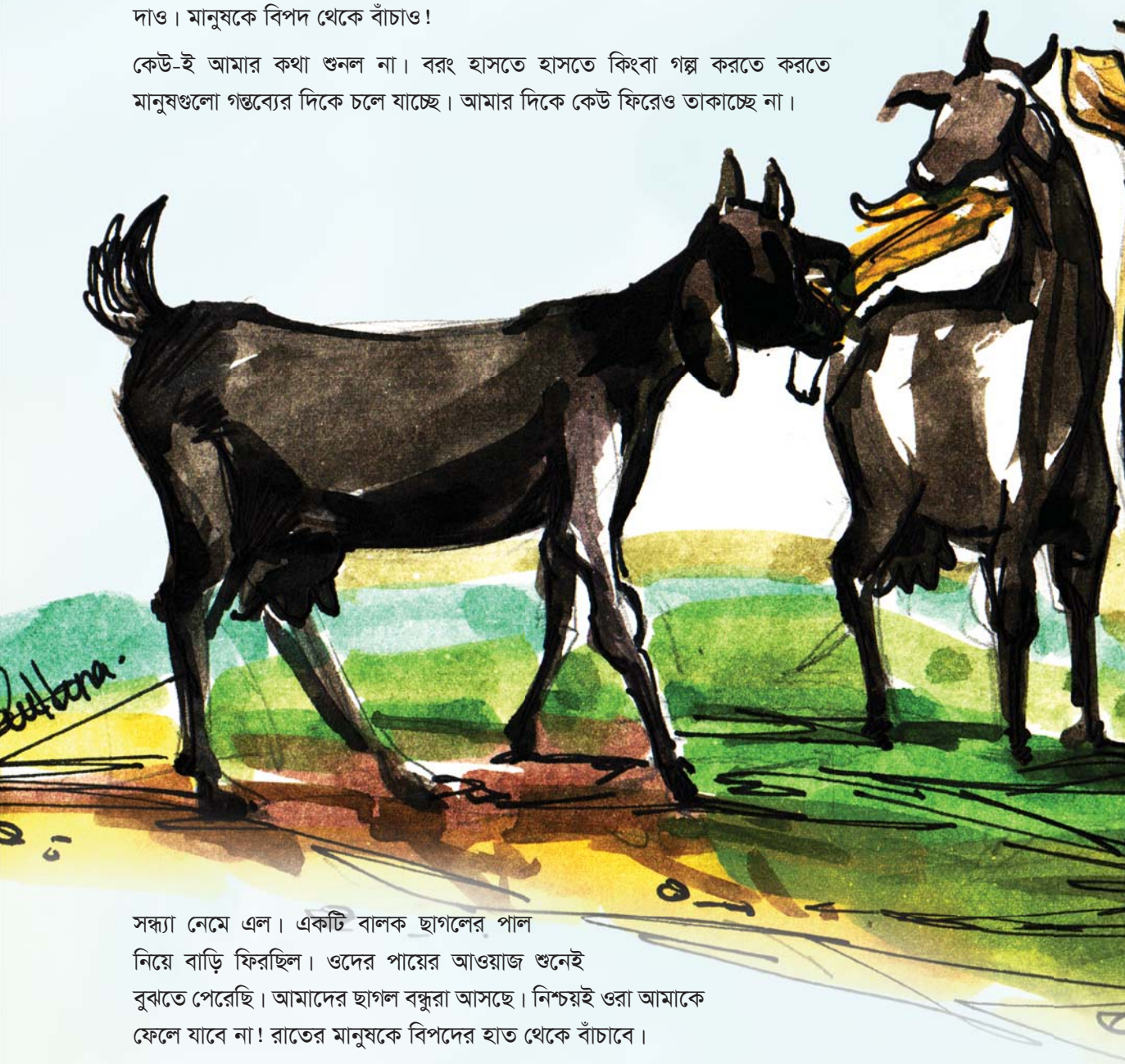

সন্ধ্যা নেমে এল। একটি বালক ছাগলের পাল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। ওদের পায়ের আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছি। আমাদের ছাগল বন্ধুরা আসছে। নিশ্চয়ই ওরা আমাকে ফেলে যাবে না! রাতের মানুষকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবে।

ছাগলের পাল এগিয়ে এল। তখনও পুরোপুরি সন্ধ্যা নামেনি। সবকিছু দেখা যাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই একটি ছাগল দৌড়ে এল এবং মুখে তুলে নিলো পরম যত্নে। আরো দুই একটি ছাগল এগিয়ে এল ভাগ বসাতে। কিন্তু তার আগেই আমার কম্ম সাবাড়! আমাকে গপাৎ করে পেটে চালান করে দিলো। ❑

শিশুসাহিত্যিক

ছাত্র-গণআন্দোলনের গল্প

আমি খুব ভীতু

তারিক মনজুর

আমি নিতু। আমার বয়স এখন ছয় বছর। ছয় বছর বয়সে সবাই সাহসী হয়। কিন্তু আমি খুব ভীতু। আমি কেন এত ভীতু, নিজেও জানি না। মাকড়সা দেখলে আমার ভয় লাগে। টিকটিকি দেখলেও ভয় লাগে। তবে সবচেয়ে ভয় লাগে তেলাপোকা দেখলে। মরা তেলাপোকা দেখলে আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠি।

আমি ভীতু। তাই আমার বন্ধু সাফিন আমাকে দেখলেই খ্যাপায়। চোখ বড়ো বড়ো করে টেনে টেনে বলে,

নিতু নিতু

ভীতু ভীতু।

সাফিন আমাদের বিল্ডিংয়ের উপরের তলায় থাকে। সবচেয়ে উপর তলায়। সাফিনের বয়সও ছয় বছর। বয়স যাদের একই থাকে, তারা বন্ধু হয়। তাই সাফিন আমার বন্ধু। ভালো বন্ধুরা কখনো বন্ধুকে খ্যাপায় না। সাফিন আমাকে খ্যাপায়। তারপরেও সাফিন আমার ভালো বন্ধু।

ভালো বন্ধুর সাথে অনেক মিল থাকে। কিন্তু সাফিনের সাথে আমার মিল নেই। সাফিন সাহসী, আমি ভীতু। আবার, সাফিনের নানি থাকে সাফিনের সাথে। আমার নানি আমার সাথে থাকে না। থাকে না কারণ আমার নানি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। কবে চলে গেছেন তা আমি জানি না। শুধু জানি, অনেক আগে চলে গেছেন। তখন হয়ত আমার জন্মও হয়নি।

আচ্ছা, কোনো মানুষ আগে জন্মায়, আর কোনো মানুষ পরে জন্মায় কেন? আবার কোনো মানুষ আগে মরে যায়, কেউ পরে মারা যায় কেন? সব মানুষ যদি একসাথে জন্মাতো, আর একসাথে মারা যেত, তবে ভালো হতো।

এ রকম অনেক কথাই আমি ভাবি। তবে সব কথা আমি সবাইকে বলি না। বলি না, কারণ সবাই আমার কথা বোঝে না। মাঝে মাঝে সাফিনও বুঝতে পারে না। একদিন সাফিনকে বলেছিলাম, 'সব মানুষ একসাথে জন্মালে ভালো হতো।'

সাফিন আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুই একটা গাধা!'

আমি বললাম, 'কেন? সব মানুষ যদি একসাথে জন্মাতো, তবে সবাই সবার বন্ধু হতো।'

সাফিন মুখ চোখা করে বলল, 'সবাই সবার বন্ধু হয় নাকি? কেউ হয় বাবা, কেউ হয় মা। কেউ হয় নানা, কেউ হয় নানি।'

আমি বললাম, 'যে যেমনই হোক, সবার একদিনে জন্ম হওয়া উচিত। আবার একদিনে মরে যাওয়াও উচিত।'

সাফিন জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব করে বলল, 'হ্যাঁ, কিছু মানুষ অবশ্য একদিনে জন্ম নেয়। আবার একদিনে মরেও যায়।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেটা আবার কেমন?'

সাফিন বলল, 'কেন? হাসপাতালে দেখিসনি? হাসপাতালে অনেক বাচ্চার একসাথে জন্ম হয়। আবার যুদ্ধের সময়ে সবাই একসাথে মরে যায়।'

সাফিনের কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমার জন্ম হয়েছে হাসপাতালে। সেদিন ওই হাসপাতালে আরো চারটা বাচ্চার জন্ম হয়েছিল। এটা মা আমাকে বলেছেন। তার মানে, সেই চার জন আর আমি – আমাদের সবার জন্ম একই দিনে। আমাদের সবার বয়স তাহলে ছয়। অবশ্য সাফিনের বয়সও ছয়। তবে ওর জন্ম হয়েছে আরেক হাসপাতালে।

সাফিন বলে, ওর জন্মের আগে ওর নানি এসেছিল ওদের বাড়িতে। তারপর থেকে নানি ওদের সাথেই থাকে। সাফিনের জন্মের কয়েক দিন আগে ওর নানা মারা যান। ওর নানি এরপর থেকে ওদের সাথেই থাকেন। তার মানে এই বাড়িতে সাফিন আর ওর নানি প্রায় একই সাথে এসেছে।

সাফিনের নানি সাফিনকে খুব আদর করে। সাফিনও নানিকে ছাড়া কিছু বোঝে না। ওর নানি নাকি ওর মনের কথা বুঝতে পারে। সাফিনও নানির মনের কথা বুঝতে পারে। এ কথা সাফিন অনেক বার বলেছে। তবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না।

সাফিনের অনেক কথাই আমার বিশ্বাস হয় না। ছেলেটা অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে। সেসব কথা সত্যি না মিথ্যা, আমি বুঝতে পারি না। কয়েক দিন আগে বলল, 'জানিস নিতু, ছাত্ররা আন্দোলন করছে।'

আমি বললাম, 'আন্দোলন কী জিনিস?'

সাফিন বলল, 'ধুর বোকা! আন্দোলন বুঝিস না? আন্দোলন হলো রাস্তায় মিছিল করা।'

'মিছিল কী?'

'মিছিল কী, তাও জানিস না!' সাফিন আমাকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে, 'মিছিল হলো সবাই একসাথে হওয়া।'

ঈদের সময়ে আমার বাবার বন্ধুরা একসাথে হয়। মায়ের বোন আর ভাইরা একসাথে হয়। সেটাকে তো মিছিল বলে না। তাহলে রাস্তায় সবাই একসাথে হলে মিছিল হয়? আমি বুঝতে পারি না। সাফিন বলে, 'রাস্তায় একসাথে হলেই মিছিল হয় না। একসাথে স্লোগান দিতে হয়। একসাথে কিছু চাইতে হয়।'

আমি সব কথা বুঝতে পারি না। সাফিন অনেক কিছু বোঝে। সাফিনকে জিজ্ঞেস করি, 'ছাত্ররা কেন স্লোগান দেয়? ওরা কী চায়?'

সাফিন বলতে পারল না ছাত্ররা কী চায়। তবে দিন দিন আন্দোলন, মিছিল আর স্লোগান বড়ো হতে লাগল। আর যত বড়ো হতে লাগল, তত সবকিছু অন্য রকম হতে লাগল। আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। সাফিনদের স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল। বাবা দেখলাম অফিসে যাচ্ছে না। মা ঠিকমতো ঘরের কাজ করছে না। একটু পরপরই রাস্তা থেকে গোলাগুলির শব্দ আসে। বিকট আওয়াজ হয়। আন্দোলন, মিছিল আর স্লোগানের শব্দ আসে।

বাবা সারাক্ষণ টেলিভিশন চালিয়ে বসে থাকেন। মাও বাবার পাশে টেলিভিশনের সামনে বসে থাকেন। দুজনে ইউটিউবে ভিডিও দেখেন। পত্রিকা খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে বাবা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'এসব কী হচ্ছে' মা বলে, 'এবার মনে হয় আর পারবে না।'

কী হচ্ছে, আর কে পারবে না, এসব আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে ঝামেলা একটা চলছে, এটা বুঝতে পারি। ছাত্রদের সাথে হাজার হাজার মানুষ যোগ হয়েছে। একসাথে মানুষ দেখলেই পুলিশ গুলি করে। মা উত্তেজিত হয়ে বলে, 'পুলিশ গুলি করবে কেন?' বাবাও বলে, 'হ্যাঁ, দেশের মানুষকে পুলিশ গুলি করবে কেন?'

এরপর প্রতিদিন নতুন নতুন খবর আসতে লাগল। মানুষ মরতে লাগল পাখির মতো। পুলিশ কেন এভাবে মানুষকে মারছে আমি বুঝতে পারি না। সাফিনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, 'এখন দেশে যুদ্ধ চলছে।' আমার মনে পড়ল সেই কথা। সাফিন বলেছিল, 'যুদ্ধের সময়ে সবাই একসাথে মরে যায়।'

তারপর একদিন ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেল। ইন্টারনেট বন্ধ থাকলে কিছুই ঠিকমতো দেখা যায় না। তাই কেউ কিছুই দেখতে পেল না। সাফিন আমাদের বাসায় এসে চুপি চুপি বলল, 'ছাদে উঠলে সবকিছু দেখা যায়। দেখবি?'

আমি বললাম, 'না। বাবা বাইরে যেতে দেবে না।'

সাফিন চলে গেল। তারপর কী হলো আমি জানি না। পরে শুনেছি, সাফিন আর ওর নানি ছাদে উঠেছিল। তারপর একটা গুলি লাগে সাফিনের কপালে। আচ্ছা, গুলি কি এত উপরে উঠতে পারে? আমি বুঝতে পারি না। সাফিনের মা-বাবা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছে, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই সাফিন মরে গেছে।

আন্দোলন, মিছিল আর স্লোগান কী, আমি এখনো বুঝতে পারি না। তবে বুঝতে পারি, আমি আর আগের মতো ভয় পাই না। সাফিন মরে যাওয়ার পর আমি সাহসী হয়েছি। আমি আর মাকড়সা ভয় পাই না। টিকটিকি ভয় পাই না। তেলাপোকা দেখলেও ভয় পাই না। মরা তেলাপোকা দেখলে ছুড়ে ফেলে দিই। ❑

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বীর শহিদের স্বপ্ন

ফরিদ সাইদ

কোটার দাবির ছাত্র মিছিল
শুরু হলে দেশে
নাটের গুরু সব মহাশয়
টিটকারি দাও হেসে।

আন্দোলনের বাড়ল গতি
দেখতে যখন পেলে
গুলির আদেশ দিয়ে তখন
মারলে কত ছেলে।

বুক পেতে দেয় আবু সাঈদ
করলে তাঁকে গুলি
সারা দেশে লাশের সারি
কেমনে এ শোক ভুলি।

মাহফুজ-মুগ্ধ পানি হাতে
প্রাণ দিয়েছে হেসে
কোনোরকম স্বার্থ ছাড়া
দেশকে ভালোবেসে।

ফয়সাল, রিজভী, ইয়ামিনরা
আসবে না আর ফিরে
নাম না জানা সকল শহিদ
আছে হৃদয় ঘিরে।

কাজের মাঝে বীর শহিদের
স্বপ্নপূরণ করি
মিলেমিশে নতুন করে
সোনার বাংলা গড়ি।

দীপ্ত দাশ, দ্বিতীয় শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ টিউটোরিয়াল স্কুল, চট্টগ্রাম

গল্প

ওরে বাবা সাপ

মুহাম্মদ বরকত আলী

সকাল সকাল ডুগডুগির শব্দ বাতাসে ভেসে এল। ডুগডুগ ডুগডুগ। তেমাথা রাস্তার মোড় থেকে ডুগডুগির আওয়াজটা বাতাসে ভেসে আসছে। ছেলে-মেয়ের দল সেদিকেই ছুটছে হৈ হৈ রৈ রৈ করে। নিশ্চয়ই সাপুড়ে এসেছে। সাপের খেলা দেখাবে। কি মজা! আহা কি মজা! সোয়াইব ঘর থেকে বের হয়েই দে'ছুট। এক দৌড়ে তেমাথা রাস্তার মোড়ে এসে হাজির।

একজন বাবরি চুলওয়ালা সাপুড়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছেন তো বাজিয়েই চলেছেন। সকলে হই-হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে।

একজন বলল, 'বাবুরাম সাপুড়ে এসেছে। বাবুরাম সাপুড়ে।'

অন্য কেউ একজন, 'দেখে যাও, দেখে যাও, বাবুরাম সাপুড়ে এসেছে।'

অন্যরা সবাই, 'সাপরে সাপ, বাপরে বাপ!'

যে যার মতো বলছে। আর হই-হুল্লোড় চলছে।

সাপুড়ে তার সাপের ঝুড়িটা রেখে ডুগডুগি বাজিয়ে বলল, 'আমি সাপুড়ে সর্দার, বাবুরাম সাপুড়ে। সাপ খেলা দেখাই। বাপুরে বসে যা, দেখে যা। এমন সাপ আগে তোরা কোথাও দেখিসনি। দেখে যা, দেখে যা।' ডুগগগগগ..... ডুগডুগগগগ...।

হাতের ডুগডুগিটা বার কয়েক বাজিয়ে, সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুড়ে' ছড়াটা কাটল:

'যে সাপের চোখ নেই,
শিং নেই, নখ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না,
করে না কো ফোঁসফাঁস
মারে নাকো ঢুসঢাস,
নেই কোন উৎপাত,
খায় শুধু দুধভাত।'

(সুকুমার রায়ের বাবুরাম সাপুড়ে ছড়াংশ।)

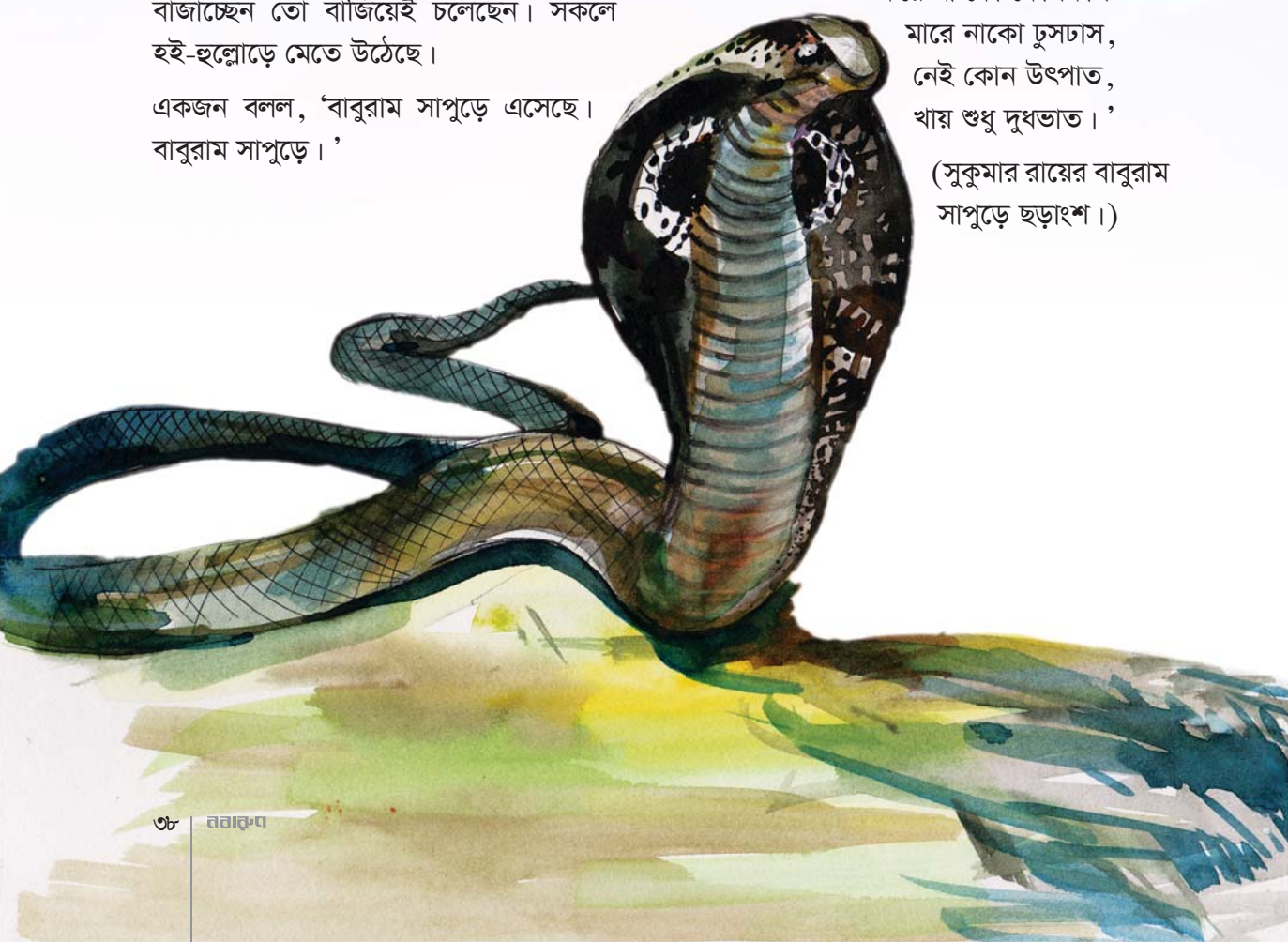

ডুগির শব্দে এরই মধ্যে গ্রামের ছেলে-মেয়ের দল ছুটে এসেছে। বড়োরাও কম আসেনি। সবাই দেখতে চায় সাপ খেলা।

সোয়াইব বলল, 'বাবুরাম সাপুড়ে, দেখাও এবার খেলা রে।'

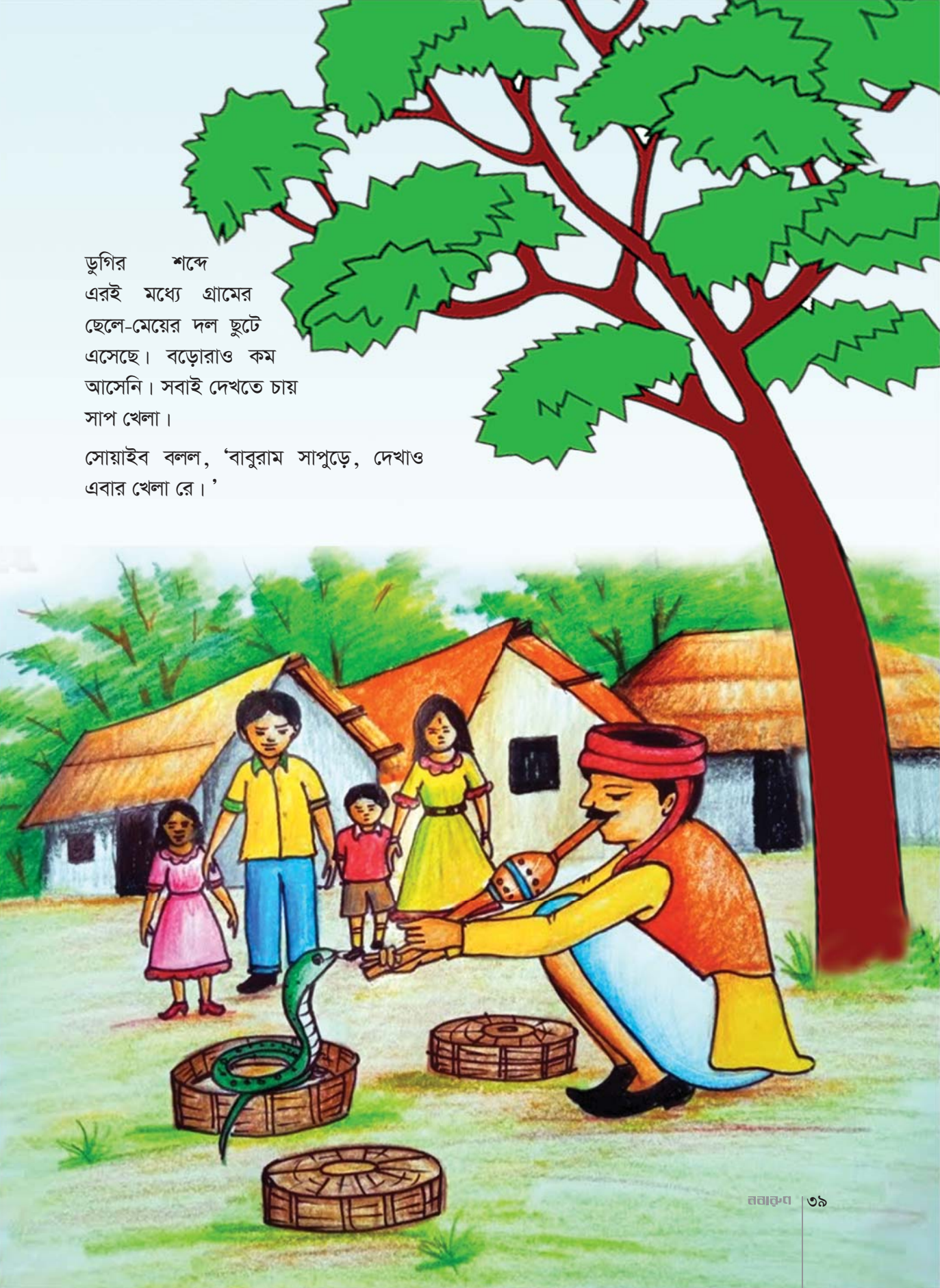

সাপুড়ে বলল, 'উহু বাপু। এখন না। সবাই চাইল (চাল) আর পঁয়সা নিয়ে আসো, তারপর দেখবে সাপের খেলা। সাপের খাবারের পয়সা না পেলে সাপ বের করব নাকো। যাও যাও, চাইল (চাল) আর পঁয়সা নিয়ে আসো গিয়ে। '

সবাই ছুটল বাড়ির দিকে। সোয়াইব বাড়িতে গিয়ে বলল, 'মা, ও মা, আমাকে চাল দাও তো। সাপের খেলা দেখব। সাপের জন্য চাল দাও। বেশি করে দিয়ো।'

যে যার মতো চাল আর পয়সা এনে ঢেলে দিল সাপুড়ের ঝোলায়। অনেক চাল জমা হলো। পঁয়সাও নেহাত কম নয়। সবার বলাবলিতে বাবুরাম সাপুড়ে সাপ বের করতে রাজি হলো।

সাপুড়ে লাঠি দিয়ে গোল করে দাগ কেটে দিল। বলল, 'এই দাগের ভিতরে কেউ আসবি না। আসলেই সাপে কাটবে। মেয়েরা মাথার চুল খোলা রাখিস না। বিপদ হবে।' মেয়েরা যারা ছিল সবাই বিপদের ভয়ে কাপড় দিয়ে মাথার চুল ঢেকে রাখল।

বাবুরাম সাপুড়ে ডুগডুগিটা আবারও বার কয়েক বাজিয়ে ঝুড়ির ঢাকনা খুলে বলল, 'এই আস্তে। শান্ত হ।

কামড়াবি না।

করবি নাকো ফোঁসফাঁস।

তোর জন্য সবাই চাউল দিয়েছে। বেরিয়ে আয়। বেরিয়ে আয় বলছি। '

বৃত্তের বাইরে সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেউবা বসে আছে। মুখে কারো কোনো কথা নেই।

এরই মধ্যে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে এল মস্ত বড়ো এক সাপ। সাপের সামনে দুধভাত মাখানো থালাটা দিল সাপুড়ে। কয়েক চুমুকেই দুধভাত খেয়ে সাবাড় করল সাপটি।

সাপুড়ে বলল, 'কে আছিস খুব সাহসি ছেলে? কার আছে হিম্মত? হাত উঠা দেখি। '

সোয়াইব মনে মনে বলল, 'যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই, নখ নেই, তাকে আবার ভয় কীসের?' ডান হাত উঁচু করল সোয়াইব।

সাপুড়ে বলল, 'সাব্বাস ব্যাটা। এদিকে আয়।'

সোয়াইব ধীরে ধীরে সাপুড়ের কাছে এগিয়ে গেল। সাপুড়ে সাপটা ধরে সোয়াইবের গলায় জড়িয়ে দিল। সোয়াইব ভয়ে ভয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সাপের শরীর কত্ত ঠান্ডা!

বাবুরাম সাপুড়ে সাপটিকে বলল, 'জিব বের কর।' অমনি সাপটা তার লিকলিকে জিবটা পিটপিট করে বের করল। এবার গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তোর সাহস আছে।' একটা তাবিজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নে তাবিজ। কালো ডোর দিয়ে মাজায় বেঁধে রাখবি। কোনোদিন সাপ তোর ধারে কাছেও ভিড়বে না।'

দাঁড়িয়ে থাকা সবাই হাততালি দিল। মস্ত বড়ো সাপটা ধূলোয় এঁকেবেঁকে ঘুরছে সাপুড়ের দাগটানা সারা বৃত্তের চারিপাশ। যা পায়ের কাছে যাচ্ছে সেই-ই ভয়ে চিৎকার করে উঠছে, 'সাপ'রে সাপ, বাব'রে বাপ।'

'ভয় পাস না খোকারা–খুকিরা। এ সাপের শিং নেই, ঢুস মারবে না। দাঁত নেই, কামড়াবে না। করবে নাকো ফুঁসফাঁস।'

'কী মজা, কী মজা!'

সাপের খেলা শেষ করে বাবুরাম সাপুড়ে ঝাঁপি গুছিয়ে অন্য কোনো গ্রামের দিকে পা বাড়ালো।

ডুগ-ডুগ, ডুগ-ডুগ...। সাপের খেলা ...। ❑

সুকুমার রায়'র 'বাবুরাম সাপুড়ে' ছড়া অবলম্বনে।

অক্টোপাসের বন্ধু

খায়রুল আলম রাজু

সোমবারের দুপুর। রিমন স্কুল থেকে ফিরেই চিৎকার করে উঠল। বলল, 'মা! আজকে আমরা সমুদ্রের নিচে ঘুরতে যাব।' মা রান্নাঘর থেকে মাথা বের করে বললেন, 'সমুদ্রের নিচে? তুমি তো সাঁতারই জানো না!'

রিমনের উত্তর প্রস্তুত, 'মা, আমাদের দরকার নেই সাঁতার জানার। মাসুদ স্যার বলেছেন, আমরা একটি বিশেষ সাবমেরিনে চড়ে যাব।'

সন্ধ্যায় রিমন তার বন্ধুদের সঙ্গে জেটির দিকে রওনা দিল। সেখানে ছিল সত্যিই এক অদ্ভুত সাবমেরিন। দেখতে ঠিক যেন বড়ো মাছের মতো। চালক এক বয়স্ক লোক, যাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি কোনো বিজ্ঞানী।

বাচ্চারা সাবমেরিনে উঠতেই চালক তাদের বললেন, 'তোমরা সবাই বসো। এই সাবমেরিন পানির নিচে গিয়ে সমুদ্রের গোপন রাজ্য দেখাবে। তবে সাবধান, কোনো কিছু স্পর্শ করবে না।'

যাত্রা শুরু হলো। চারপাশে শুধু নীল পানি। রিমন জানালা দিয়ে দেখল, ছোটো ছোটো রঙিন মাছ সাঁতার কাটছে। তার পাশে থাকা শামীম খুশিতে লাফিয়ে বলল, 'ওই দেখ! ওটা কি ডলফিন?'

হঠাৎ সাবমেরিনে কাঁপুনি শুরু হলো। চালক বললেন, 'ধরে বসো সবাই! সাবমেরিন একটি বড়ো পাথরের সঙ্গে আটকে গেছে।'

'এখন কী হবে?' রিমনের চিৎকার।

চালক মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। সাবমেরিন ঠিক করতেই হবে।'

এদিকে শামীম বলল, 'চাচা, সাবমেরিন ঠিক করতে কতক্ষণ লাগবে?'

চালক একগাল হেসে বললেন, 'তোমরা বরং এদিকে তাকাও। সামনেই একটা ডুবোজাহাজের ধ্বংসাবশেষ। সেখানে নিশ্চয়ই অনেক ধনসম্পদ আছে।'

এবার রিমন আর শামীম জানালা দিয়ে দেখতে পেল বিশাল এক ধ্বংসাবশেষ। মনে হচ্ছিল পায়ে হাঁটতে গেলে ঠিক হারিয়ে যাবে।

'ওটা থেকে কোনো রত্ন নিয়ে আসা যায় না?' রিমনের চোখ চকচক করে উঠল।

চালক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না। কারণ ওখানে বিশাল অক্টোপাস থাকে। যদি রাগ করে তাহলে সাবমেরিনকেই উল্‌টে দেবে।'

এ কথা শুনে সবাই ভীত হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ-ই তাদের চোখে পড়ল এক অক্টোপাস তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রিমন চিৎকার করে বলল, 'চাচা, এবার কী হবে?'

চালক হেসে বললেন, 'ভয় পেয়ো না। এটি আমাদের সাবমেরিনের বন্ধু। এখন দেখো কীভাবে সে আমাদের উদ্ধার করে।'

অক্টোপাসটি তার লম্বা একটি শুঁড় দিয়ে সাবমেরিনটি পাথর থেকে সরিয়ে দিল। সবার মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকা।

রিমন ফিসফিস করে বলল, 'চাচা, এই অক্টোপাসটিকে বাসায় নিয়ে যাওয়া যাবে?'

চালক হেসে বললেন, 'তুমি পারলে নিয়ে যাও। তবে সাবধান, ও তোমার বিছানা দখল করে নেবে।'

সবাই একযোগে হেসে উঠল। সাবমেরিন আবার ওপরে উঠতে লাগল। সেই যাত্রার গল্প রিমন আর তার বন্ধুরা সারা জীবন মনে রাখবে। ❑

নির্বাহী সম্পাদক, ছোটোদের পত্রিকা শিশুটামি

অক্টোপাস

নুসরাত কিন্তি

শামুকের জাত ভাই
নাম তার অক্টোপাস
আটটি শুঁড় আর পা নিয়ে
গভীর সমুদ্রে করে বসবাস।

শিকারিদের কাছ থেকে বাঁচতে
মারে কালি ছুঁড়ে
ছদ্মবেশ ধারণ করে
দ্রুত পালিয়ে যায় সরে।

অর্নাস ২য় বর্ষ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ

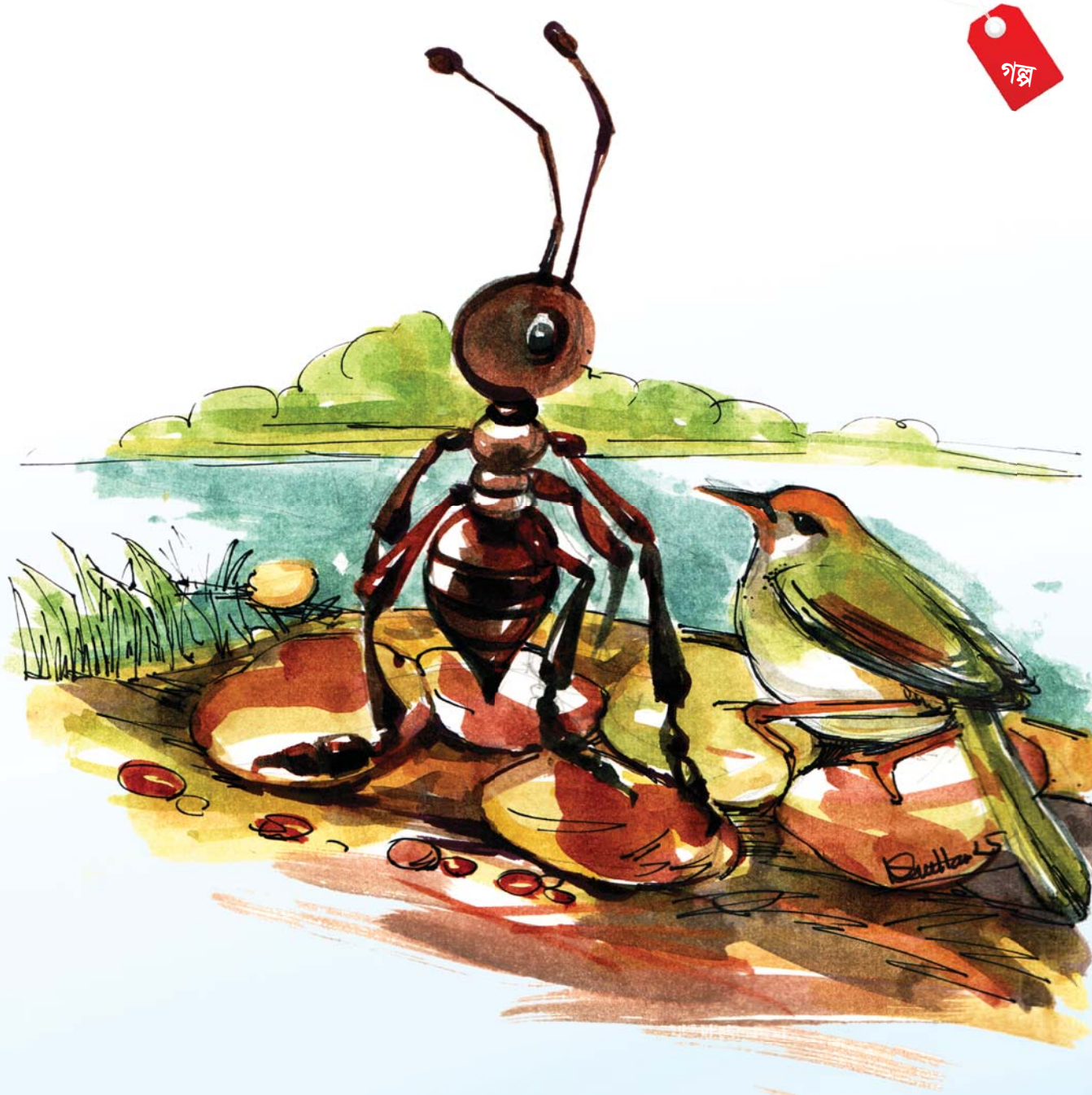

আলো

ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

একটি ছোট্ট গ্রাম, যেখানে পুকুরে সবুজ শেওলা ভেসে থাকত এবং আকাশে সারাদিন সাদা মেঘেরা ঘুরে বেড়াতো, সেখানে একটি পিঁপড়ে এবং একটি পাখির অদ্ভুত বন্ধুত্ব ছিল। পিঁপড়ে ছিল খুবই বুদ্ধিমান এবং অনেক কিছু জানত, আর পাখি ছিল খুব মিষ্টি এবং সদয়, কিন্তু পিঁপড়ের মতো গভীর চিন্তা করার ক্ষমতা

তার ছিল না। তবে পাখি পিঁপড়ের সঙ্গে অনেক গল্প করত এবং তার কাছ থেকে নতুন কিছু শিখত।

একদিন পিঁপড়ে ভাবল, 'আজ আমি আমার বন্ধু পাখিকে একটি নতুন ধাঁধা দেব। নিশ্চয়ই সে এই ধাঁধার সমাধান করতে পারবে।'

পিঁপড়ে পাখির কাছে গেল এবং বলল, 'শোনো, আমি তোমাকে একটা ধাঁধা দেব। তুমি বলো, কোন জিনিস, যা সবাই দেখি কিন্তু কখনোই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি না? আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারি, কিন্তু আমি নিজে একটুও সরি না। পাখি খানিকটা হতভম্ব হয়ে পিঁপড়ের দিকে তাকালো। সে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর পিঁপড়ে আবার বলল, 'ভালো করে তুমি চিন্তা করো, আমি অপেক্ষা করছি।'

পাখি তার ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বসে ভাবতে লাগল। সে আকাশের দিকে তাকালো, পিঁপড়ের প্রশ্ন ভাবতে ভাবতে। পিঁপড়ে তখন হাসছিল, কারণ সে ভাবছিল পাখি খুব দ্রুত উত্তর খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু পাখি কিছুই বুঝতে পারছিল না।

পাখি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'ঠিক আছে, আমি জানি না। তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

পিঁপড়ে পাখির পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কীভাবে তোমার উত্তর দেই না? একটু ভাবো, আর মনে করো, কী এমন বস্তু থাকে, যা আমরা সবাই দেখি, কিন্তু কখনোই ধরতে পারি না?'

পাখি মাথা চুলকে বলল, 'এটা কী হতে পারে?'

পিঁপড়ে একমুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর হেসে বলল, 'এটা তো খুব সহজ! তুমি তো জানো, এটা আলো। আলো সব জায়গায় থাকে, কিন্তু তুমি সেটা কখনোই স্পর্শ করতে পারো না। আলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে, কিন্তু নিজে কখনো এক জায়গা থেকে সরে না।'

পাখি একদম চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ! আলোই তো সেটা। কী সহজেই তুমি উত্তরটা খুঁজে পেলে!'

পিঁপড়ে হেসে বলল, 'এটা তো আসলে খুব সহজ ছিল। কিন্তু যখন তুমি জটিল কিছু ভাবতে থাকো, তখন সহজ জিনিসগুলো হারিয়ে যায়।'

পাখি তার মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ পিঁপড়ে। আমরা অনেক সময় এতই জটিল সমস্যায় আটকে পড়ি যে সহজ সমাধানগুলি আমরা দেখতে পাই না। তোমার কাছ থেকে আমি এক নতুন পাঠ শিখলাম সবসময় সরলভাবে চিন্তা করতে হবে।'

পিঁপড়ে বলল, 'আমি তো শুধু একটি ছোট্ট ধাঁধা দিলাম, কিন্তু তুমি দেখেছ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, নিজেদের চিন্তা-ভাবনার পথ সোজা রাখা। জটিলতা যখন আসে, তখন মনে রেখো, অনেক সময় সহজ উত্তরই থাকে।'

পাখি হাসি দিয়ে বলল, 'তুমি অনেক বুদ্ধিমান পিঁপড়ে। আমি জানতাম তুমি আমাকে কিছু শিখাবে, কিন্তু তুমি তো আমার চিন্তা-ভাবনাকেই পালটে দিলে।'

পিঁপড়ে আরও কিছুক্ষণ পাখির সঙ্গে বসে গল্প করল, তারপর তারা একসঙ্গে আকাশের দিকে তাকালো। সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিম দিকে ডুবছিল, আর আকাশে রঙিন মেঘেরা ঝলমল করছিল।

এভাবে পিঁপড়ে এবং পাখি তাদের বন্ধুত্ব আরও গভীর করল এবং তারা বুঝতে পারল যে জীবনে বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান ছোটো ছোটো জিনিস থেকেই আসে, যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করি। ❑

শিক্ষার্থী, কবি ও গল্পকার, অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় ঋতু

মোহাম্মদ অংকন

আমাদের দেশে ভাদ্র-আশ্বিন এই দুই মাস নিয়ে শরৎকাল। প্রকৃতিতে বর্ষার প্রকোপ যখন কমতে শুরু করে, বিল-ঝিল থেকে পানি যখন নদীতে নেমে যেতে থাকে, নদীতে যখন থেমে যেতে থাকে প্রবল স্রোতোধারা, তখনই যেন শরতের আগমন ঘটে। মাঝে মাঝে বর্ষাকাল দীর্ঘায়িত হওয়ায় শরৎ এলেও ঠিক বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে যে শরৎ এসেছে কিনা। তবে শরৎ যে এসে পড়েছে, তা তার নিজস্ব আচরণেই উপলব্ধি করা যায়। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে গুণে দেখতে হয় না যে ভাদ্র মাস শুরু হল কিনা। কেননা, এই সময়ে আকাশ থাকে বেশ ঝকঝকা। মনে হয় আকাশের সকল মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে মেঘশূন্য হয়ে পড়েছে। পুরো বর্ষায় যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে, শরতে তা না হওয়ায় বলা যেতেই

পারে শরৎ আসলে আকাশ যেন মেঘশূন্য হয়ে যায়। আকাশটাকে ভীষণ সাদা দেখায় ও অনেক দূরে মনে হয়। শরৎ যেহেতু বৃষ্টির ঋতু না, তাই তার বৃষ্টি নামানোর কোনো ধরাবাঁধা নিয়মও নেই। তবুও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে রোদের তীব্রতাকে কমিয়ে শীতলতার ছোঁয়া দিয়ে যায়।

বৈশ্বিক জলবায়ু বিপর্যয় ও গ্রীনহাউজ ইফেক্টের কারণে শীতকাল ব্যতীত প্রকৃতিতে বছরের বেশিরভাগ সময় উত্তাপ থাকলেও শরতের আবহাওয়া থাকে নাতিশীতোষ্ণ। এজন্য শরৎ ঋতু অনেকের কাছে ভীষণ প্রিয় মনে হয়। শুধু কি এজন্যই প্রিয় মনে হয়? তা নয়, বর্ষা পরবর্তীতে শরতের প্রকৃতিতে কেমন যেন সবুজাভ ও সতেজভাব বিরাজ করে। গাছের পাতাগুলোকে একটু বেশিই সবুজ মনে হয়। বর্ষায় মাটিতে পর্যাপ্ত পানির যোগান থাকায় গাছপালা যেন পানি, পুষ্টি, সার শরীরে নিয়ে নিজেদের সারা বছর সতেজতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। তাই তো বর্ষার পর শরতের শুরুর দিকে যেসব ফল পাওয়া যায়, তা ভীষণ স্বাদের হয়ে থাকে। শরতে পাওয়া কয়েকটি ফলের নাম- আমলকী, জলপাই, জগডুমুর, তাল, অরবরই, করমচা, চালতা, ডেউয়া ইত্যাদি। এগুলো খেতে মজা লাগে কি না?

গ্রীষ্মের ছুটিতে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু খাওয়ার পর শরতের ফলের দিকে অনেকেরই তেমন নজর থাকে না। কিন্তু আম্মু যখন আমলকী, চালতা, জলপাইয়ের আচার তৈরি করেন, তালের পিঠা বানান, তখন সেসবের প্রতি লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। বাড়ির আঙিনা বেয়ে বয়ে আসা শরতের মৃদু বাতাসে বসে কিংবা টইটুম্বুর নদীর ধারের গাছতলার মাচালে বসে মায়ের হাতে বানানো মুখরোচক সেসব খাবার খেতে কী যে মজা লাগে, তা বলে বোঝানো যাবে না।

শরতের ফলে যেমন মজার রেশ আছে, একটা চিরচেনা ফুলের প্রতিও সবার দুর্বলতা প্রবল। হ্যাঁ, সেই ফুলটির নাম কাশফুল। শরৎ মানেই চোখের পরতে ভেসে আসে শুভ্রসাদা কাশফুলের নয়নাভিরাম দৃশ্য। বর্ষার পানি নেমে নদীর ধার জেগে ওঠে, সেই নদীর ধারে থাকা প্রতিটি কাশবন নিজেকে কাশফুলে সাজিয়ে তোলে। সবুজ দেহে সাদা চুলে কাশবনকে যেন পুরোপুরি বুড়ো দাদুর মতোই লাগে! বাতাসে যখন কাশবনগুলো দুলে ওঠে, মাঝি যখন পাশ দিয়ে নৌকা নিয়ে ছুটে চলে, সেই দৃশ্য দেখার মতো উপভোগ্য আর কী-বা আছে। কাশবনে চড়ুই, টুনটুনি পাখি বাসা বাঁধে। মৃদু রোদে কাশবনে প্রজাপতি, ফড়িং আর চড়ুই-টুনটুনির নাচানাচি, উড়াউড়ি দেখতেও বেশ উপভোগ্য লাগে। নিজের তখন ওদের মতো হতে ইচ্ছে করে।

শরতের প্রারম্ভে বর্ষার পানি কমে আসায় ডুবে যাওয়া রাস্তাঘাট জেগে ওঠে, রাস্তায় কচি ঘাস জন্মায়, নদীতেও করালগ্রাসী স্রোত থেমে যায়। এ সময় ছোটো নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে কেউই আর ভয় পায় না। বিকেলের রোদ গড়াতেই নদী-বিলে ছোটো ছোটো নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা। পানির ওপর ভাসতে ভাসতে সন্ধ্যার সূর্য ডোবা দেখা যায়। সূর্য ডোবার আগমুহূর্তে সূর্যকিরণ যখন পানিতে আছড়ে পড়ে, পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ সূর্যকিরণের দৃশ্যকে আরও মনোরম করে তোলে। শরৎকালে দিনের পরিমাণ দীর্ঘ হওয়ায় বিকেলটা বেশ বড়ো মনে হয়। তাই নৌকা নিয়ে ঘোরার জন্য বেশি সময় হাতে মেলে। কোনো কারণে যদি নদী-বিলের মাঝখান থেকে ফিরতে দেরি হয় আর সেই সময়টায় যদি আকাশে চাঁদ ওঠে, সেই চাঁদের আলো যদি পানিতে আছড়ে পড়ে, মনটা তখন বাড়িতে ফিরতেই চায় না। ফিরতে না চাইলে কি আর হবে? বাসায় ফিরে গিয়েই তো লিখতে হবে যে কেন শরৎ আমার প্রিয় ঋতু? স্কুলে বাংলা স্যারও যে এ নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন।

সত্যি, শরতের এত মুগ্ধতার গল্পে যে কেউ-ই শরৎকে প্রিয় ঋতু করে নিতে একবারও ভাববে না। শীতের কনকনে ঠান্ডা, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহ, বর্ষার ঘনঘন বৃষ্টির চেয়ে শরতের নীরব ও শান্ত পরিবেশ মনটাকেও শান্ত করে তোলে। শরতে প্রকৃতিতে যে উজ্জ্বলতা মিশ্রিত হয়, তা যেন মনকে উজ্জ্বল করে যায়। শরতের ভালোবাসার স্নিগ্ধতা সারা বছর মনের ভেতর থাকে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও ফিচার লেখক

বন্ধু

কোমল দাস

বন্ধু ছাড়া মানেই হলো জীবনশূন্য জড়ো
এই জগতে বন্ধুত্বই সবার থেকে বড়ো,
মাতাপিতার সাথে প্রেমটা যখন বাড়ে
বন্ধুত্ব হয়ে গেছে সবাই বলে তারে,
এতেই বুঝি এ সম্পর্ক সবার থেকে সেরা
বন্ধুত্বের ভালোবাসা বটের ছায়ায় ঘেরা।

এ সম্পর্ক নয় বিশাল এটার মান
বন্ধুত্ব ভেঙো না তাই যায় যদি যাক প্রাণ,
বন্ধুত্বের বাঁধন ভেঙে কেউ করো না ভুল
বন্ধু হলো পরম আপন উদ্দীপনার মূল।

বিলাতি টিংকু

রফিকুল নাজিম

ছোট্টো টিংকু হেব্বি পাংকু
ডাল-ভাত সে খায় না,
স্যান্ডউইচ আর বার্গার প্রিয়
ভাতে স্বাদ পায় না।

চোখে পরে রঙিন চশমা
মোটা কাচের ফ্রেমটা,
শাকসবজিতে মুখ রুচে না
মাছে নাই তার প্রেমটা।

ছোট্টো টিংকুর বিশাল দেহ
গায়ে শক্তি পায় না,
জাংক ফুড আর কোল্ড ড্রিংকস
খেতে ধরে বায়না।

মা'কে টিংকু মাম্মাম ডাকে
মায়ের হাতে খায় না,
হাবভাবে সে জাত বিলাতি
বাঙালি হতে চায় না!

নির্বাচনি ইশতাহারে 'কচুরিপানা'

ফজলুল হক

বিস্তীর্ণ জলাশয়। খুবই হালকা বেগুনি ছয়টি পাপড়ির মধ্যে ঠিক উপরেরটিতে ময়ূরের পালকের মত নীল রংয়ের নকশা থাকে। তার মাঝে হলুদ রঙের একটা তিলক। ফুটে থাকে রাশি রাশি ফুল। দেখে মনে হয় শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোনো ছবি। ফুলটি কোনো সুবাস না ছড়ালেও এর নান্দনিক রূপে মুগ্ধ আমরা সবাই। ফুলটিকে অনেকে 'হেনা' বলে ডাকেন। কিছু এলাকায় এটি 'কস্তুরি' ফুল নামেও পরিচিত। ফুলটির নাম কচুরিপানার ফুল। পানি পেলে কচুরিপানার ফুল প্রায় সারা বছরই ফোটে। তবে বেশিদিন স্থায়ী হয় না। নাজুক এ ফুল কাণ্ড থেকে আলাদা করলে খুব দ্রুতই নুয়ে পড়ে। তাই এ ফুল জলাশয়ে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই মুগ্ধতা ছড়ায়। সাধারণত ফোটে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। কচুরিপানার একটি পুষ্পবৃন্ত থেকে ৮-১৫ টি আকর্ষণীয় ছয় পাঁপড়ি বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন ফুলের থোকা বের হয়। অনাদর আর অবহেলায় বড় হয়েও যে সৌন্দর্যের দিক থেকে নামিদামি ফুল থেকেও অনেক স্নিগ্ধ আর মোহনীয় হওয়া যায়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ কচুরিফুল। বাজারে এই ফুল বিকিকিনি হয় না, অর্থাৎ অর্থমূল্য নেই।

কচুরিপানার হালকা বেগুনি রঙের অর্কিড-সদৃশ ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জর্জ মরগান নামে এক স্কটিশ ব্যবসায়ী ব্রাজিল থেকে বাংলায় কচুরিপানা নিয়ে আসেন। এর আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকায়। এরা মূলত স্রোতহীন স্বাদু পানিতে জন্মায়। মুক্তভাবে ভাসমান বহুবর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদের মধ্যে অন্যতম। সবুজ পাতাবিশিষ্ট এই কচুরিপানা পানির ওপরে এক মিটার পর্যন্ত বড় হতে পারে। বাংলাদেশে খাল, বিল, নদী বা যে-কোনো আকারের জলাশয়ে সবুজ পাতার যে কচুরিপানা দেখা যায় সেটা প্রায় দেড়শো বছর আগেও এ অঞ্চলে কেউ চিনতো না - এটি এখানে জন্মাতো না। কচুরিপানার বাংলায় আগমন ঘটেছিল ১৮৮৪ সালে। জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া বলছে, ১৮শ শতকের শেষভাগে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল থেকে কচুরিপানা নিয়ে আসা হয়েছিল। আমাজন জঙ্গলের জলাশয়ে থাকা উদ্ভিদ এটি।

কচুরিপানার বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম অংশ Eichhornia নামটি এসেছে প্রুসিয়ান রানির নাম থেকে। রানি এই ফুলের রূপে মুগ্ধ ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, প্রুসিয়ার রানি আইকরনিয়ার শখের টবে থাকা কচুরিপানা, কোনো এক বৃষ্টিস্নাত গোধূলিবেলায় পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে চলে আসে। তারপর দ্রুত বর্ধনশীল ও বংশ বিস্তারে পটু কচুরিপানা জলাশয় ছাপিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এর কমন নাম Common water hyacinth, Water hyacinth ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক নাম Eichhornia crassipes। Eichhornia গণে এদের সাতটি প্রজাতি আছে। কচুরিপানার সাতটি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নামের Eichornia Crassipes-এর গণ অংশটি রানী আইকরনিয়ার নাম হতেই নেওয়া বলে অনেকে ধারণা করেন। তবে অধিকাংশের মতে, প্রুসিয়ান শিক্ষামন্ত্রী কার্ল ফ্রেডরিক আইকরনের সম্মানে এই নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নামেই এই কচুরিকে ডাকা হয়ে থাকে, কোথাও Terror of Bengal নাম প্রচলিত। ডিপ্লয়েড গোছের ৩২টি ক্রোমজমের সমন্বয়ে গঠিত এই আগ্রাসি উদ্ভিদটি জ্যামিতিক হারে বিস্তৃত হয়। পুরু, চকচকে এবং ডিম্বাকৃতির পাতাবিশিষ্ট কচুরিপানার। বর্ষাকালে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে। এদের বীজ ৩০ বছর পরেও অঙ্কুরোদগম ঘটাতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতির জলচর পাখি এদের বীজ বিস্তারে সাহায্য করে। মুক্তভাবে অবাধ ভাসমান বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় জলজ উদ্ভিদটির বায়ুকুঠুরি থাকায় খুব সহজেই পানির ওপর ভেসে থাকতে পারে। শীতের সময় কচুরিপানা মরে যায়। আবার নোনা পানিতেও বাঁচে না।

সম্ভবত ব্রিটিশ ভারতে কচুরিপানাই একমাত্র উদ্ভিদ, যা দমনের জন্য 'কচুরিপানা নির্মূল আইন ১৯৩৬' প্রণীত হয়। এই কচুরি নিয়ে এতটাই ত্যক্ত-বিরক্ত হলো জনগণ যে, ভোটের মাঠেও উত্তাপ ছড়াল এই কচুরিপানা। নালা-নর্দমায় নির্বিচারে বেড়ে উঠা কচুরিপানা জায়গা করে নিল একেবারে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনি ইশতাহারে! ১৯৩৭-এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলার সব দলের অঙ্গীকার ছিল কচুরিপানা নির্মূল করা। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক নির্বাচনে জয়লাভ করে কচুরিবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। অবাক করার মতো বিষয় হলো, কচুরি নির্মূলে দেশব্যাপী আপামর জনতা 'কচুরি নির্মূল সপ্তাহ' পালন করে। তবে কচুরির পক্ষেও ব্রিটিশ ভারতে তখন কিছু লোক ছিল। কেননা কচুরির রাসায়নিক ব্যবচ্ছেদে ভালো পরিমাণ পটাশের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আর প্রাদেশিক সরকার মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়। দেশভাগের পর ষাটের দশকে সামরিক শাসক আইয়ুব খান রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে কচুরি নির্মূলের পরিকল্পনা করেন, কিন্তু জলজ বাস্তুসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে বিধায়, সুধীসমাজের চাপে তাকেও বিরত থাকতে হয়।

সহজলভ্যতা ও অর্থমূল্য না থাকায়, কৃষকের অনন্য এক আস্থার নাম এই কচুরিপানা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে গৃহবাড়ির গবাদিপশুর নিত্যদিনের খাবারের জোগান দিয়ে থাকে এই পানা, বিশেষ করে বর্ষার সময়ে।

কচুরিপানা এখন প্রধানত সার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। আধুনিক জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'র অন্যতম একটি স্তম্ভ 'সবুজকৃষি' অর্জনেও কচুরিজাত বায়ো-ফার্টিলাইজার এক অসাধারণ বিকল্প। কচুরির পাতা আর মূলের মাঝে ফাঁপা কাণ্ডসদৃশ অংশটি দূষিত পানি থেকে ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল, সীসা এবং পারদসহ বিভিন্ন ভারী ধাতুসমূহ শোষণ করে নিতে পারে, যা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইতিমধ্যে প্রমাণিত। যে কারণে এরা শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ মিশ্রিত পানিকে জৈব পদ্ধতিতে দূষণ মুক্ত করতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নিচু এলাকাগুলোয় এই কচুরিপানা স্তূপ করে ভাসমান বেড বানিয়ে সবজি চাষ হচ্ছে।

কচুরিপানা খুবই সহনশীল একটি উদ্ভিদ। হাওর অঞ্চল এবং সংলগ্ন এলাকাতে ঢেউয়ের আঘাত থেকে ভিটে-মাটি রক্ষায় ব্যবহৃত হয়। তবে এই মূহুর্তে কচুরিপানা সবচেয়ে বড়ো অবদান রাখছে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটিরশিল্পে। এর ডাটা শুকিয়ে ঝুড়ি, আসবাবপত্র, হ্যান্ডব্যাগ, দড়ি, ন্যাপকিন, পাপোস, ফুলের টব, কাগজ, মাদুরসহ নানা ধরনের গৃহস্থালি সামগ্রী তৈরি হচ্ছে, যা পরিবেশবান্ধব এবং প্লাস্টিক সামগ্রীর বিকল্প। তাছাড়া বর্ষাকালে বন্যা কবল এলাকায় গবাদি পশুর খাদ্য হিবেসেও ব্যবহার হয়। দক্ষিণাঞ্চলের কিছু গ্রামে কচুরিপানা থেকে একধরনের কাগজ উৎপাদন হচ্ছে। এই কাগজ বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কচুরিপানার পরিবারের অনেকেই আমাদের খাবার পাতে বহুকাল ধরেই আছে। কচুর কন্দ, লতি, ডাঁটা, পাতা ইত্যাদি আমাদের অনেকেরই প্রিয় খাবার।

মাছ চাষেও কচুরিপানার ব্যবহার আছে। কচুরির দাড়ির মতো শিকড়ের ভাঁজে ভাঁজে মাছ আশ্রয় নেয়। চিংড়ি, কই মাছের খুব প্রিয় আবাস এই কচুরিপানা। তাছাড়া গরমে পানি শীতল করে এ উদ্ভিদ। অনাদরীয় উদ্ভিদকুলের শীর্ষ তালিকায় কচুরিপানা থাকলেও নানা আঙ্গিকে কচুরিপানার তুলনা শুধুই কচুরি । ❑

প্রাবন্ধিক

কচুরিপানা

নাসরিন জাহান রূপা

পানির বুকে ভাসে তারা
কচুরিপানার দারুণ ধারা।
বৃষ্টি এলে নাচে সবাই,
ফুল ফোটে যে ঝলমল ভাই।

হেলে দুলে নদীর কোলে,
সাজে তারা দারুণ রোলে।
ডাঙায় গেলে শুকিয়ে যায়,
পানির মাঝে প্রাণ যে পায়।

নদী, খাল বা পুকুরজলে,
সবুজ শাড়ি পরে চলে।
কচুরিপানা সবার বন্ধু,
প্রকৃতির এক মধুর ছন্দ

সবার প্রিয় কাশফুল

কাশফুল বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফুলগুলোর মধ্যে একটি। ছোটো-বড়ো সবার কাছে সমান প্রিয়। শরত ঋতুতে সাদা ধবধবে কাশফুল ফোঁটে। এটি একধরনের বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। যার বৈজ্ঞানিক নাম Saccharum spontaneum। এরা সাধারণত ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এ ফুলের আদিবাস রোমানিয়া।

নদীর ধার, জলাভূমি, চরাঞ্চল, পাহাড় কিংবা গ্রামের কোনো উঁচু জায়গায় এরা বেড়ে ওঠে। তবে নদীর তীরেই এরা বেশি জন্মায়। এর কারণ হলো নদীর তীরে পলিমাটির আস্তর থাকে এবং এই মাটিতে কাশের মূল সহজে ছড়াতে পারে। বাংলাদেশের সব

অঞ্চলেই কাশফুল দেখা যায়। কাশফুল পালকের মতো নরম এবং রং ধবধবে সাদা। গাছটির চিরল পাতার দুই পাশ খুবই ধারালো।

পৃথিবীতে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের ফুলের এত কদর দেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যেও এ ফুলের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শুভ কাজে কাশফুলের পাতা বা ফুল ব্যবহার করা হয়। এটি এমন একটি ফুল নেই কোনো সৌরভ, যায় না গাঁথা কোনো মালা। খোঁপায় গোঁজার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কাশবনের মনোরম সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করে প্রবলভাবে। এই সময়ে শরতের আকাশের মেঘমালা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানে গানে বলছেন,

'অমল ধবল পালে লেগেছে
মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া'।

শরতের সঙ্গে মেঘ, কাশফুল আর শিউলির সম্পর্ক যেন অচ্ছেদ্য। একটি ছাড়া আরেকটি বেমানান। এ সময়ে আকাশের ক্যানভাসে শুভ্র মেঘের ছায়া কাশফুলের রূপ ধরে যেন নেমে আসে পৃথিবীতে। দিনের শুরু কিংবা শেষ বিকেলের মৃদু হাওয়ায় মাথা দোলানো কাশফুল চোখ জুড়িয়ে দেয়। নদীর তীর ঘেঁষে জেগে উঠা কাশফুল দূর থেকে মনে জাগায় নতুন এক শিহরণ।

কাশফুলের রয়েছে বেশ কিছু ঔষধি গুণ। যেমন– পিত্তথলিতে পাথর হলে নিয়মিত গাছের মূলসহ অন্যান্য উপাদান দিয়ে ওষুধ তৈরি করে পান করলে পিত্তথলির পাথর দূর হয়। কাশমূল বেটে চন্দনের মতো নিয়মিত গায়ে মাখলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। এ ছাড়া শরীরে ব্যথানাশক ফোঁড়ার চিকিৎসায় কাশের মূল ব্যবহার করা হয়। ❑

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কাশবনের গান

মো. নাজমুল হোসেন

কাশবনে হেলে পড়ে সোনালি রোদ্দুর
শরতের আকাশে নাচে মেঘের সুর।

হাওয়া বয়ে যায় স্নিগ্ধ মন ভরে
কাশফুল দোলে ঢেউ তুলে ধীরে ধীরে।

সাদা তুলোর পরী যেন দিগন্তে হাসে
নরম বাতাসে মন রাঙিয়ে ভালোবাসে।

পাখিরা গায় গান, মিষ্টি সুরে ভাসে
কাশবনের মাঝে স্বপ্ন জড়িয়ে আসে।

নরম তুলোর ছোঁয়ায় মন যে হারায়
শরতের ছোঁয়ায় প্রাণ যেন ভাসায়।

নবারুণ লেখকের সাফল্য

মীম নোশিন নাওয়াল খান। নবারুণের ক্ষুদে লেখক। আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার গেটিসবার্গ কলেজে স্নাতকে রসায়নের সেরা শিক্ষার্থী হয়েছেন। সমাবর্তনে বিভাগের পতাকাবাহকও ছিলেন অদম্য এই তরুণী।

মিমের বয়স যখন পাঁচ বছরের কিছু কম তখন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাওয়া মানুষদের গল্প নানুর মুখে শুনে বিদেশে পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মীম। কলেজে পড়া অবস্থায়ই সে স্যাট এর (Scholastic Aptitude Test) প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এইচএসসির পর সহপাঠীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত,তখন তিনি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করতে থাকেন স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাওয়ার।

ছোটোবেলা থেকেই মিমের লেখার হাত ছিল চমৎকার। খুদে লেখক হিসেবে ইউনিসেফের মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ছয় বার। এর মধ্যে তার ১৭টি বইও প্রকাশিত হয়।

স্যাটেও ভালো স্কোর থাকায় আমেরিকার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল স্কলারশিপসহ ভর্তির সুযোগ হয়ে যায়। একইসাথে ফিনল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তির সুযোগ হয়ে যায়। শেষমেষ পেনসিলভানিয়ার গেটিসবার্গ কলেজে ভর্তি হন।

২০২০ সালের আগস্টে ক্লাস শুরুর কথা থাকলেও কোভিডের কারণে তখন আমেরিকা যাওয়া হয়নি। অনলাইনেই প্রথম সেমিস্টার শেষ করেন। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন মুল্লুকে পাড়ি জমানোর পর শুরু করেন জীবনের নতুন অধ্যায়।

দ্বিতীয় সেমিস্টারে সামার রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য আবেদন করে এবং রসায়ন বিভাগের প্রথম বর্ষের একমাত্র শিক্ষার্থী হিসেবে তা পেয়েও যায়। শুধু তাই নয়, পর পর তিন বছর ফেলোশিপটি পায়। এছাড়া সেমিস্টার চলার সময় গবেষণার কাজও করেন। দ্বিতীয় বর্ষে তার গবেষণা উপস্থাপনের সুযোগ পেয়ে যায় বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো আন্তর্জাতিক কনফারেন্সগুলোর একটা আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির স্প্রিং কনফারেন্সে। পরের দুই বছরও এই কনফারেন্সে যাওয়ার সুযোগ হয়। এছাড়া স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের আরো কিছু কনফারেন্সেও অংশ নেন।

মিম গত চার বছর রসায়নে অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, যা তাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে। দক্ষিণ পেনসিলভানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রসায়নে 'সেরা শিক্ষার্থী'র পুরস্কার দেয় আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি। যেটি পায় তৃতীয় বর্ষে। এছাড়া 'ভার্জিনিয়া উলফ এসে কন্টেস্টে' প্রথম হয়। স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য গেটিসবার্গের রসায়ন বিভাগের যত পুরস্কার ও সম্মাননা আছে, সবগুলোই মীমের ঝুলিতে।

বিদেশে পড়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে অমূল্য তার ভাষায় ভ্রমণ। এখন পর্যন্ত কানাডাসহ আমেরিকার ২১টি রাজ্যে গিয়েছেন মীম। তার মতে, পছন্দের বিষয়ে পড়লে সাফল্য আসা সময়ের ব্যাপার। একা একা বাইরে থাকতে গিয়ে নিজের কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে নতুন কিছু চেষ্টা করার মাধ্যমেই নিজেকে জানা ও বোঝা যায় ভালোমতো। ❑

প্রতিবেদন : মনোয়ারা বেগম

শরতের শিউলি

শরৎ মানেই শিউলি ফুলের আগমন। শরৎ মানেই শিউলি ফুলের সমাহার। বর্ষার সৌন্দর্যকে সঙ্গে নিয়েই ঋতু বৈচিত্র্যের ধারায় আমাদের মাঝে উপস্থিত হয় ঋতুরানি শরৎকাল। ঋতুরানি শরতের একটি শ্রেষ্ঠ উপহার শিউলি ফুল।

শিউলি ফুল রাতে ফোটে বলে একে রাতের রানিও বলা হয়। আবার সকাল হওয়ার আগেই ফুল ঝরে যায় বলে শিউলি গাছকে বিষণ্ন বৃক্ষও বলা হয়।

শিশির ভেজা পথে বা সবুজ ঘাসের গালিচায় ঝরে পড়া কমলা সাদার এই শিউলি ফুলের সৌন্দর্যে চোখ আটকে যায় প্রতিটি মানুষেরই। কুয়াশা জড়ানো ঝিরিঝিরি শীতল বাতাস এই ফুলের মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। চিরাচরিত গ্রাম-বাংলায় শিউলি একটি ভালো লাগার নাম। আবহমান কাল ধরে শরৎ ও হেমন্তের সঙ্গে শিউলি ফুলও মানুষের মনে জায়গা করে আছে নবান্নের মতোই আনন্দ ও ভালো লাগার অংশ হয়ে।

শরতের শিউলি ফুল বাংলা সাহিত্যের অনেকটা অংশজুড়ে আছে। শিউলি ফুলের রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শিউলি ফুলকে নানাভাবে তুলে ধরেছেন।

শিউলি না ফুটলে শরতের শুভ্রতা যেন অপূর্ণই থেকে যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মুগ্ধ হয়েছিলেন এই শিউলির রূপে। তিনি লিখেছিলেন, 'শিউলি ফুল শিউলি ফুল, কেমন ভুল এমন ভুল/ রাতের বায় কোন মায়ায় নিল হায় বনছায়ায়।' তিনি আরও লিখেছেন, আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা/ নবীন ধানের মঞ্জরি দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা। শিউলি ফুলকে নিয়ে এমন অজস্র পঙক্তি বাংলা সাহিত্যকেও সুবাসিত করে রেখেছে ফুলের মতোই। শিউলি ফুলের আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন- শেফালি, শেফালিকা, পারিজাত।

শিউলি ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম Nyctanthes arbor-tristis. এটি হচ্ছে নিক্টান্থেস (Nyctanthes) প্রজাতির একটি ফুল। এটি দক্ষিণ এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যান্ড থেকে পশ্চিমে বাংলাদেশ, ভারত, উত্তরে নেপাল, ও পূর্বে পাকিস্তান পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যফুল ও থাইল্যান্ডের কাঞ্চনাবুরি প্রদেশের প্রাদেশিক ফুল এটি। শিউলি গাছের বাকল বা ছাল নরম ও ধূসর বর্ণের হয় এবং এই গাছ ১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছের পাতাগুলো ৬-৭ সেন্টিমিটার লম্বা ও সমান্তরাল। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ এবং খসখসে হয়। এই ফুলের রয়েছে পাঁচ থেকে সাতটি সাদা পাপড়ি এবং এর মাঝে গাঢ়-কমলা টিউবের মতো বৃন্ত। এই কমলা অংশ দিয়ে শিশু-কিশোর ছবিতে রঙের ছাপ দেয়। মালা গেঁথে পরে। পুতুলের গলায় পরায়। মেয়েরা খোঁপায় পরে। ভোর হলেই তারা ছুটে যায় শিউলি তলায়। এর ফল চ্যাপ্টা ও বাদামি, দেখতে হৃৎপিণ্ডাকৃতির। ফলের ব্যাস ২ সেন্টিমিটার এবং এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগে একটি করে বীজ থাকে।

শিউলি ফুলের যেমন আছে মিষ্টি গন্ধ আর মন ভালো করে দেওয়ার মতো রঙের মিশ্রণ, তেমনি আছে এর বেশ কিছু ঔষধি গুণও। খালি পেটে শিউলি গাছের পাতার রস খেলে কফের সমস্যা দূর হবে। সাইটিকার ব্যথা কমাতে শিউলি পাতার রস বেশ কার্যকর। দীর্ঘস্থায়ী জ্বর কমাতে শিউলির চা পান করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। আমাদের ত্বকের জন্যও শিউলির উপকারিতা অনেক। এতে আছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটারি গুণ। এটি মুখের ব্রণ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। গলার আওয়াজ বসে গেলে ২ চামচ শিউলি পাতার রস গরম করে দিনে দু'বার কয়েকদিন খেলে ভালো উপকার পাওয়া যাবে। ❑

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

নারী শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসনের পতন ও শহিদদের স্মরণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ 'শিশু মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট সিজন-৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে এ ব্যতিক্রমী আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল নারীদের একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, যা প্রচলিত ধ্যানধারণাকে ভেঙে দিয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও ত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বিশেষ ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এ খেলায় নৃবিজ্ঞান বিভাগের চারটি ব্যাচের নারী শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে মাঠে নামে। বিভাগের ৪৯তম এবং ৫১তম ব্যাচের নারী শিক্ষার্থীরা মিলে 'ফাস্ট অ্যান্ড ফেবুলাস' নামে দল গঠন করে। আর ৫০তম ব্যাচ এবং ৫২তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা 'কুইনডম' নামে দল গঠন করে মাঠে নামে। এই খেলায় বিজয়ী হয় কুইনডম দল। খেলার একমাত্র গোলটি করে ৫২ ব্যাচের শিক্ষার্থী জান্নতি।

এই খেলার আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণে উৎসাহ বৃদ্ধি করা এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ইতোমধ্যে আমাদের দেশের নারী ক্রীড়াবিদদের যোগ্যতা ও প্রতিভা প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফিফা রেফারি হিসেবে জয়া চক্রবর্তীর নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। তাই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্যাম্পাসে নারীদের ফুটবলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করাই এই আয়োজনের লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এটাই প্রথম নারীদের ফুটবল ম্যাচ। ❑

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

কৃত্রিম গাছের রাজ্যে

চার হাজার ৪০০ বর্গফুট এলাকায় গড়ে উঠেছে সুপরিকল্পিত বনায়ন। ১২০ প্রজাতির গাছ ও লতা-গুল্ম দিয়ে সাজানো হয়েছে এই বন। তুলসী থেকে কদম, বাঁশ থেকে বেত সব ধরনের প্রজাতির গাছের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে এই বনে। যার সবই স্থানীয়ভাবে পাহাড় ও সমতল জায়াগা থেকে সংগ্রহ করা। একসাথে এত প্রজাতির গাছ-লতাপাতা ঘেরা এই কৃত্রিম বনকে বলা হয় মিয়াওয়াকি ফরেস্ট।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে তৈরি করা হয়েছে দেশের প্রথম 'মিয়াওয়াকি ফরেস্ট'। উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড় এলাকায় ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে এই কৃত্রিম বন। 'প্রকল্প সোনাপাহাড়' নামের এ উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা জানান, পরীক্ষামূলকভাবে দেশের প্রথম এই কৃত্রিম বন তৈরিতে সফল হয়েছেন তারা। সবুজের সমারোহে নান্দনিক স্থাপনায় গড়ে তোলা হয়েছে প্রকল্পটি।

মিয়াওয়াকি বনটি সবুজের আবরণে সজ্জিত প্রকল্পটি যেন প্রকৃতির এক অপরূপ উপস্থাপনা। টিলাশ্রেণির মাটির কোল ঘেঁষে চার হাজার ৪০০ বর্গফুটের বনটি পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। দূর থেকে দেখলে ১৬ মাস বয়সি কৃত্রিম বনটিকে মনে হয়ে যেন এটি এক যুগ পুরনো অরণ্য। এ যেন গাছের রাজ্য। মুহূর্তের জন্য হারানো যাবে প্রকৃতির রাজ্যে। প্রকৃতির এ জীবন্ত প্রদর্শনী যেন গাছের এক জাদুঘর।

জানা গেছে, জাপানের বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ আকিরা মিয়াওকি হচ্ছেন এই 'মিয়াওয়াকি ফরেস্ট' ধারণার প্রবক্তা। এ পদ্ধতিতে ছোটো ছোটো জায়গায় অল্প সময়ে বয়স্ক বনের আদল তৈরি করা যায়। তার উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মাত্র ৩০ বর্গফুটের মধ্যেও বন তৈরি করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে লাগানো গাছ সাধারণ বনের গাছের চেয়ে ১০ গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বছরে অন্তত এক মিটার বাড়ে। মিয়াওয়াকি উদ্ভাবিত এই বন তৈরির পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো স্থানে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে গভীর বন তৈরি করা সম্ভব। আর এই বনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অন্য সাধারণ বন থেকে এই বন ৩০ গুণ বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। বর্তমানে

আকিরা মিয়াওয়াকির এই ধারণা কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় 'মিয়াওয়াকি ফরেস্ট' গড়ে তোলা হচ্ছে।

প্রকল্পটির উদ্যোক্তা আমজাদ হোসেন বলেন, মূলত মিয়াওয়াকি ফরেস্ট তৈরিতে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন প্রাকৃতিক কৃষি কেন্দ্রের উদ্যোক্তা ও পরিচালক দেলোয়ার জাহান। আমরা সেটি বাস্তবায়ন করেছি। অল্প সময়ে বন সৃষ্টির দারুণ এক পদ্ধতি 'মিয়াওয়াকি ফরেস্ট'।

প্রকল্পের পরামর্শক দেলোয়ার জাহান জানান, মাটি প্রস্তুত, জৈব উপাদান সংযোজন এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে বনায়ন করা হয়েছে। সাধারণ বন থেকে এই বন ১০ গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই প্রকল্পে স্থানীয় গাছের প্রজাতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি গভীর সম্পর্ক রেখে বন তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'মিরসরাই মিয়াওয়াকি ফরেস্ট তৈরিতে আমরা প্রথমে মাটি প্রস্তুত করেছি। সে মাটিতে জৈব সার হিসেবে গাছের গুঁড়ি, খড় ও লতাপাতার পঁচিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। আলাদা জায়গায় মাটি প্রস্তুত করে সেই মাটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিচ থেকে ওপরে কিছুটা ঢালু করে বিছানো হয়েছে। তারপর সেখানে দুই বর্গফুট জায়গার চার কোনায় চারটি করে গাছ লাগানো হয়েছে। এখানে ৪ হাজার ৪০০ বর্গফুট জায়গায় আমরা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা ১২০ প্রজাতির গাছ ও লতাগুল্ম লাগিয়েছি। তুলসী থেকে কদম, বাঁশ থেকে বেত- সব ধরনের প্রজাতির সম্মেলন ঘটানো হয়েছে এই বনে। ১৬ মাস বয়সি গাছগুলোর কোনো কোনোটির উচ্চতা ১৭ ফুট পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। বলতে পারি, মিয়াওয়াকি ফরেস্ট তৈরির চেষ্টায় সফল হয়েছি আমরা। দেশজ প্রজাতির গাছ রক্ষার পাশাপাশি এই বনটি পরিবেশ সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত। ❑

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য, নবম শ্রেণি, জুনিয়র এইড স্কুল, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

ইচ্ছে থেকেই দারুণ কিছু

প্রবাদ আছে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। তেমনি ইচ্ছেকে কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করল নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া মাদ্রাসার ছাত্র সুরুজ বিশ্বাস। মাসে লাখ টাকা আয় করছেন মানিকগঞ্জের এই মাদ্রাসা ছাত্র। স্থানীয় চর জামালপুর আলিয়া মাদ্রাসার নবম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছেন সুরুজ। লাভের টাকা দিয়ে একটি টিনের ঘরও তৈরি করেছেন তিনি। মাদ্রাসায় পড়ার পাশাপাশি দেড় বছর আগে ইউটিউব দেখে শখের বসে ৫০০টি কোয়েল পাখি দিয়ে খামার শুরু করেছিলেন সুরুজ। খামার দেওয়ার এক বছর পর থেকেই কোয়েলের ডিম বিক্রি করে তার লাভ হয় ৭০ হাজার টাকা। লাভের পাশাপাশি সুরুজদের খামারে বাড়তে থাকে কোয়েলের সংখ্যা। বর্তমানে তার খামারে রয়েছে অন্তত ১৫ হাজার কোয়েল পাখি। পাখির বাচ্চা, খাবার, ঔষধ, বিদ্যুৎ বিলসহ সব মিলিয়ে প্রতি মাসে সুরুজের খরচ হয় সাড়ে তিন লাখ টাকা। আর সে প্রতিমাসে ডিম ও পাখি বিক্রি করে সাড়ে চার লাখ টাকার। সে হিসাবে সব খরচ বাদ দিয়ে এই অল্প বয়সে সুরুজের মাসে ইনকাম থাকে অন্তত ১ লাখ টাকা। মাদ্রাসা চলাকালীন সময়ে তার খামার দেখাশোনা করেন মা শাহনাজ বেগম। তার দেখাদেখি এখন অনেকেই হতে চান সুরুজের মতো। পড়াশোনার পাশাপাশি সুরুজের এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। ভবিষ্যতে নিজের খামার আরও বড়ো করে বেকারদের কর্মসংস্থান করতে চান সুরুজ বিশ্বাস।

পাথর থেকে বিদ্যুৎ

রাতের অন্ধকারে এক নিঝুম গ্রাম। যেখানে বিদ্যুতের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু হঠাৎ পাথরের স্পর্শে জ্বলে উঠল আলো। অবিশ্বাস্য কথা তাই না! কিন্তু ঠিক এমনই এক অসাধারণ কাজ করে দেখিয়েছেন নাইজেরিয়ার কিশোর তোলানি ডেঞ্জার। কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে নয়। নিজের গ্রামের ঘরে এই আবিষ্কার করেছেন ডেঞ্জার। বয়স তার ১৬ বছর। এত অল্প বয়সে পাথর থেকে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করা অনেককেই অবাক করে দেয়। একটি রাজ্যের ইরিজিয়ান গ্রামের কিশোর সারা বিশ্বের নজর কেড়েছেন তার অভিনব এই আবিষ্কারের জন্য। ২০২৩ সালের শুরুতে তিনি পাথর থেকে বিদ্যুৎ তৈরির গবেষণা শুরু করেন। তারপর এক পর্যায়ে নিজের সৃজনশীলতা এবং কিছু সাধারণ উপাদান দিয়ে তিনি এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তোলানির বাড়ির ভেতরে একটি ব্যাটারি রয়েছে। যা তারের মাধ্যমে ওই পাথরের সাথে যুক্ত। পাথরগুলোর শক্তি কমে গেলে আলোর ঝলকানিও নিভে যায়। তোলানি বলেন, আমি ভবিষ্যতে এমন একটি পাথর তৈরি করতে চাই যা মানুষের বাড়ির পাশে বসিয়ে বিদ্যুৎ দিতে পারবে। তোলানি আসলে একজন শখের ইলেকট্রিশিয়ান। তার আবিষ্কার দেখে সবাই প্রশংসা করছেন। নাইজেরিয়ার মতো দেশ যেখানে এখনো কিছু অঞ্চল বিদ্যুৎহীন সেখানে তোলানির মতো উদ্ভাবকেরা যেন নতুন এক সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে আসছে। তার এই সৃজনশীল প্রচেষ্টা গ্রামকে আলোকিত করেছে। তোলানির এই উদ্ভাবন শুধু এ গ্রামের জন্যই নয় বরং গোটা বিশ্বের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়– সৃষ্টিশীলতা এবং উদ্ভাবন কখনই সীমাবদ্ধ থাকে না। তা হতে পারে যে-কোনো উপাদান থেকেই।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

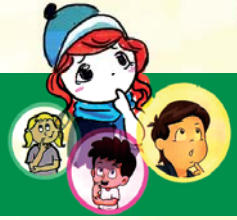

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. বিমান বা মহাকাশযানের সামনের অংশ, ২. শরৎকালের একটি ঋতু, ৪. যিনি সংবাদ লেখেন, ৬. বাতাসের প্রবল প্রবাহ, ৭. তীর, ১০. উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, ১১. ব্যবধান

উপর-নিচ: ১. দর্শনীর বিনিময়ে শোনা সঙ্গীতানুষ্ঠান, ২. গচ্ছিত বস্তু, ৩. ঝকমকি, ৫. সাইকেল, ৮. কমনওয়েলথ ভুক্ত একটি দেশ, ৯. নেতার পদ, ১০. মুকুল

■	■	১.				■	■
২.			■	■	■	৩.	■
	■	৪.		৫.			■
	■		■		■	৬.	
৭.		■	■		■		■
■	■	■	৮.	■	■	■	৯.
১০.					■	■	
	■	■		■	১১.		

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৫	*		-	১	=	
+	■	*	■	*	■	-
	*	১	-		=	২
/	■	+	■	+	■	-
২	+		-	৪	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৫	-		=	৬

ছক মিলাও

শব্দধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: গায়েবানা জানাজা, অনাবাসিক, কবিতাগুচ্ছ, অনন্তকাল, তারিখ, ফুটন্ত, কাকিনা

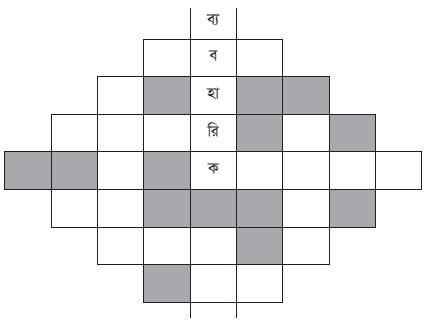

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

২৩		২৭			৩৬			৩৯
	২৫		৩১	৩০			৪৩	
		১৭		৩৩		৪৫		৪১
	১৯		৬৭		৬৫		৪৭	
১৩		১৫		৬৯		৬৩		৪৯
		৮	৭১		৮১			৫২
	১০			৭৯			৬০	
	১		৭৩		৭৭		৫৯	
৩		৫			৭৬	৫৭		৫৫

আগস্ট মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

অ	ভি	ধা	ন			গ	
ন		ত্রি		আ	ভ	র	ণ
ল		কা	ছি	ম		ম	
প্র				ন	খ		
বা	য়	স্কো	প		ড়		
হ				ক	ম	লা	
	ব	র্ষা		নু			
	ড়			ই	ঙ্গি	ত	

ছক মিলাও

			উ					
		বা	ই	শ				
	অ		কি					
	তা	ল		পি	ঠা	পি	ঠি	
		কা	বা	ডি			কা	ন
	ধা	ন		য়া		না	না	
		ন্দা			কা	ক		
			ক	পা	ল			
				ল				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৪	*	১	+	৩	=	৭
/		+		*		-
২	*	২	-	১	=	৩
+		*		-		+
১	*	৩	+	২	=	৫
=		=		=		=
৩	+	৭	-	১	=	৯

নাম্ব্রিক্স

৫	৬	৭	১০	১১	৭০	৭১	৮০	৭৯
৪	৩	৮	৯	১২	৬৯	৭২	৮১	৭৮
১	২	১৭	১৬	১৩	৬৮	৭৩	৭৪	৭৭
২০	১৯	১৮	১৫	১৪	৬৭	৬৬	৭৫	৭৬
২১	২৪	২৫	৪৪	৪৫	৬৪	৬৫	৬০	৫৯
২২	২৩	২৬	৪৩	৪৬	৬৩	৬২	৬১	৫৮
২৯	২৮	২৭	৪২	৪৭	৪৮	৪৯	৫৬	৫৭
৩০	৩৩	৩৪	৪১	৪০	৩৯	৫০	৫৫	৫৪
৩১	৩২	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৫১	৫২	৫৩

তামান্না ইসলাম, চতুর্থ শ্রেণি, কাকলি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নূরেন মাহ্‌যাবিন ওয়াসিমা, নবম শ্রেণি, একাডেমিয়া স্কুল, গুলশান শাখা, ঢাকা

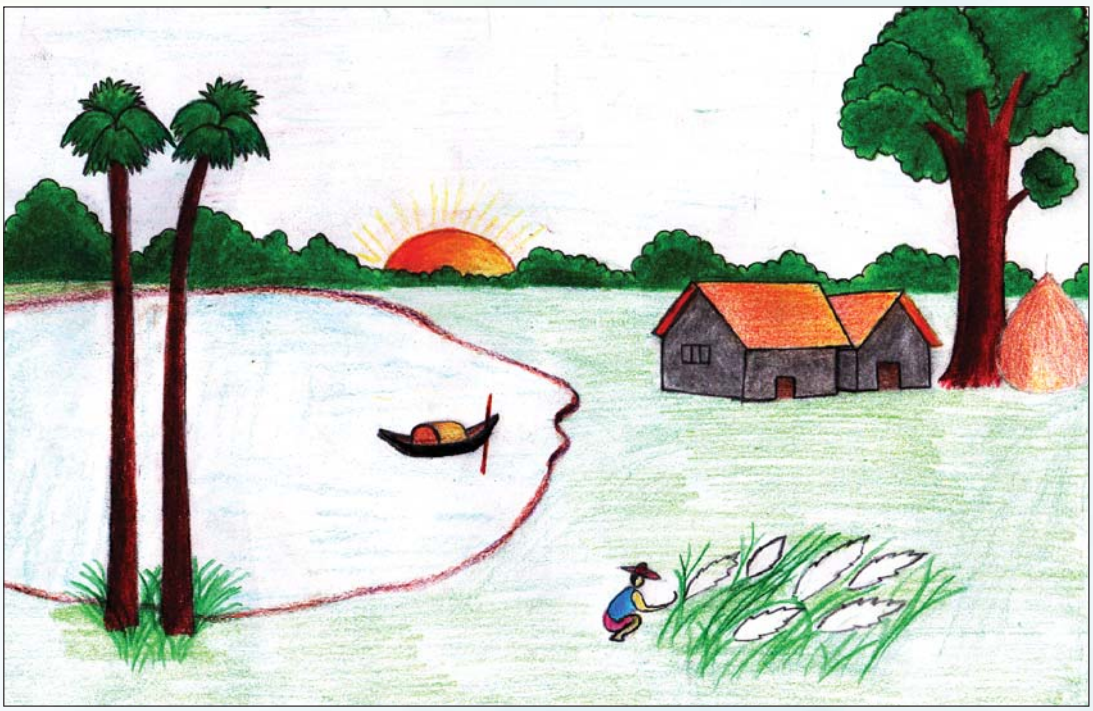

সাবিহা তাবাসসুম ফারিহা, নবম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ফারিন খান, নবম শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

রুবামা বিনতে হানিফ, তৃতীয় শ্রেণি, হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

রিজওয়ান আল রাহাত, ষষ্ঠ শ্রেণি, মানিকনগর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

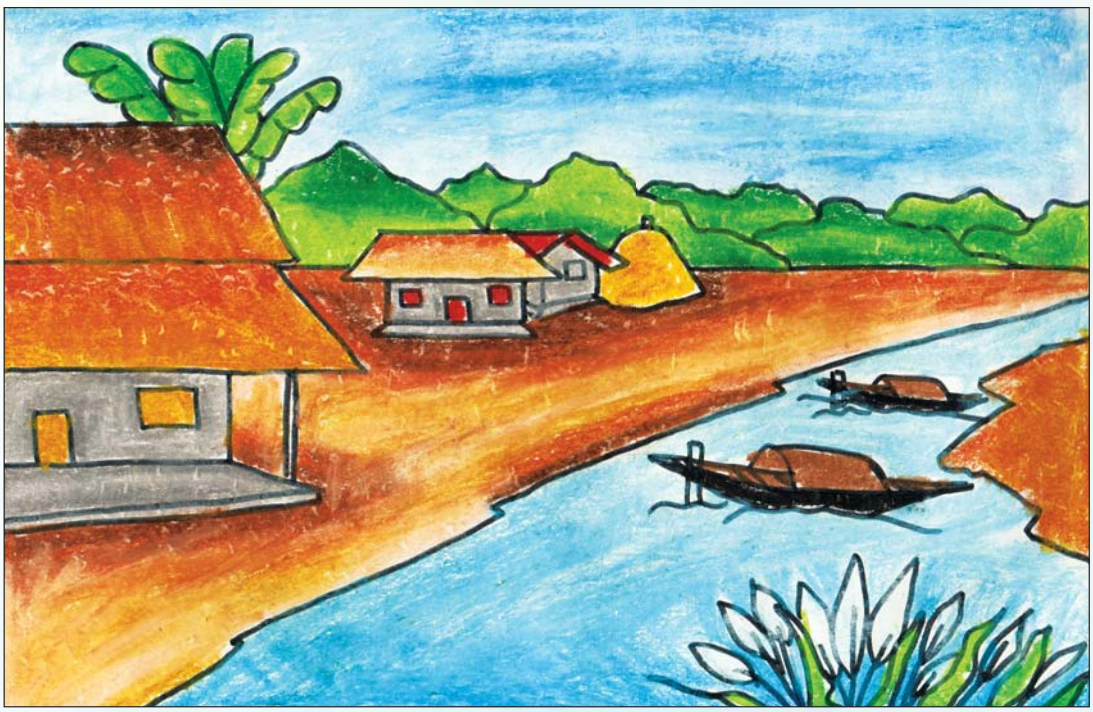

মীর্জা মাহের আসেফ, চতুর্থ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

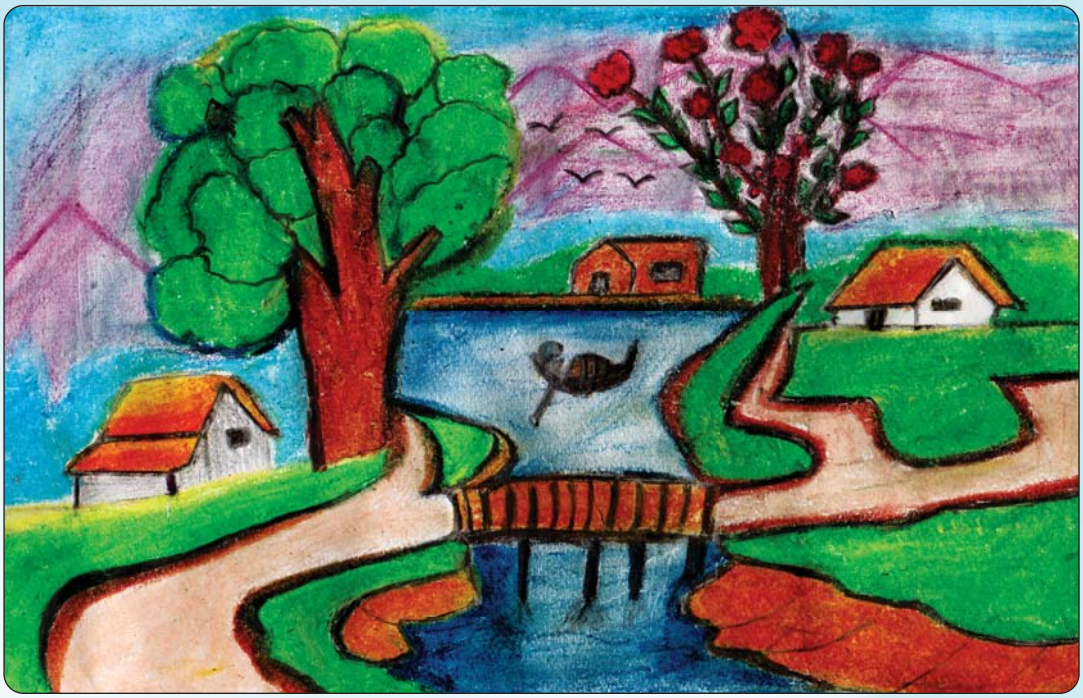

সাজ্জাদ হোসেন শান্ত, সপ্তম শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

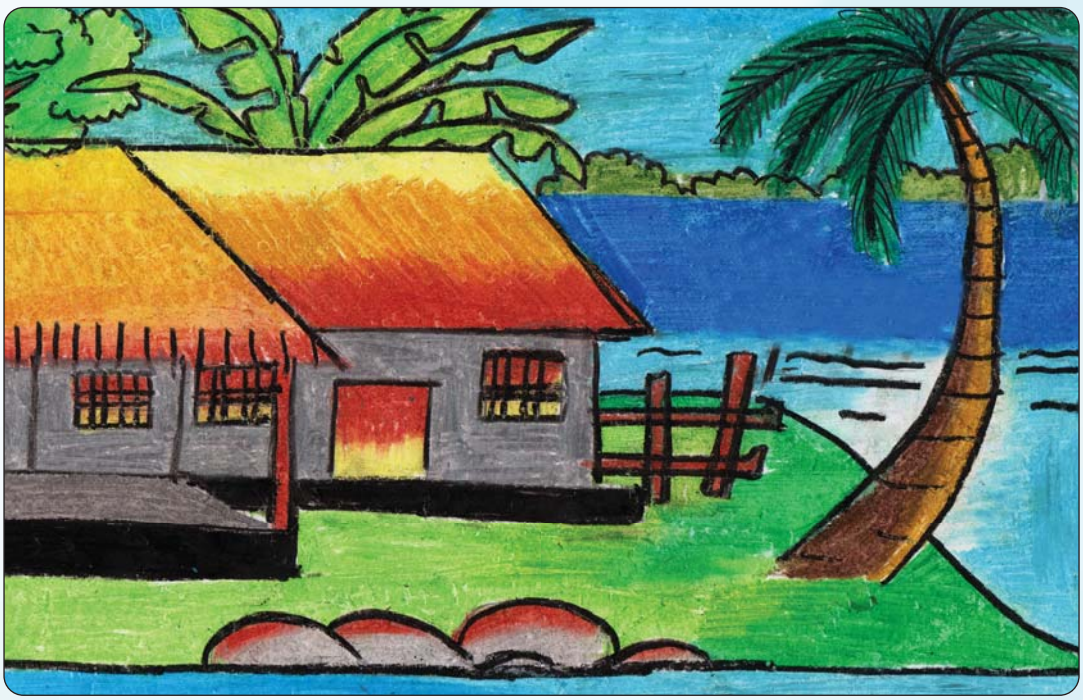

আফিফা আলম, তৃতীয় শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-03. September 2024, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

মেহরাব হাসান জারিফ, প্রথম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা